ডাক্তার জনসনের ডায়েরী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

৪৬/৫ বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯.

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীবিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬/৫ বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও টাইটেল :
বিভূতি সেনগুপ্ত

ফল্‌স্‌ পেজ :
সুধীর মৈত্র

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই :
দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

তিন টাকা

ডাক্তার ডানসোনের ডায়েরী
চিত্তরঞ্জন মাইতি

লেখকের কয়েকখানি গ্রন্থ ঃ

শৈলপুরী কুমায়ুন

কলাভূমি কলিঙ্গ

অগ্নিকন্যা

ভোরের রাগিণী

অনেক বসন্ত দু'টি মন

যে বনস্পতির উদার ছায়ায় সাহিত্য-পথযাত্রীরা নির্বিচারে বিশ্রাম-শান্তি লাভ করেছেন, সেই হৃদয়বান সাহিত্য-সাধক ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

লেখক

আমাদের ডাক্তার মামা শ্রীরঞ্জন ষড়ঙ্গী বিশেষ আমুদে মানুষ। তাঁর ডাকে সিংভূমের গুয়াতে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছিলাম। ভোজনের সঙ্গে ভ্রমণের যোগাযোগ ঘটানোর মূলে তিনিই।

রেঞ্জার সাহেব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশায়, তাঁর জীপে করে দুর্গম সারান্দা বনে আমাদের দু'টি রাত ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

ভূগোল লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, তাই সারান্দা বনের ভূগোল ভুল হলে সে দোষ আশাকরি মার্জনীয়।

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরই চোখের ওপর ফুটে ওঠে একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ ফরেষ্ট হস্‌পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কি যেন খুঁজে ফিরছেন তিনি।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়।

শনি-চা-রি-য়া···।

একটা আর্ত্ত চীৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনমোরগ আর সারো-ময়নার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু'চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার।

অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।

তবে কেন এমন করলে ?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে !

কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করতাম।

আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। আমার মত আমার দেশের মানুষকেও তুমি চিরদিন ভালবাসবে। কথা দাও, কোনদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

কথা দিচ্ছি শনিচারিয়া।

এরপর সীমাহীন নীরবতা। পাহাড়ের আড়াল থেকে অতি উজ্জ্বল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। সূর্যোদয়ের সূচনা হচ্ছে ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিস্পন্দ শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

* * *

আপনারা যদি কেউ কখনো সিংভূমের সারান্দা ফরেষ্টে আসেন তাহলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোষাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ী খাদ। তার মাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমূলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মে রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্দা

বনভূমি। কুইনা রেঞ্জ ধরে চলে আসুন। কিছুদূর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ী নদী। ভারী মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা নীল শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল কাল মাটির প্রলেপ লাগানো দেয়াল। ঐ পাহাড়ী গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন। পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরী ভাঙা গড়ের ধ্বংস-স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরণের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ায় ঘেরা আস্তানা। বেশ খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ফুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কি করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক সেই সময় হয়ত আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই একটি বাঁধান বেদীর ভেতরে ঈষৎ উঁচু একটি মঞ্চ। আপনি যদি আদিবাসী 'হো'দের সংস্কার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন ঐ মঞ্চটি 'আদিং' ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ আদিংএর ভেতর রক্ষিত আছে কোন আদিবাসীর আত্মা।

আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। একই সঙ্গে

চার্চের এলাকায় এ ধরণের আদিংএর অস্থিত্ব কি করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় এক অতি বৃদ্ধ পাত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই বিচিত্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি অমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতর। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পু থি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাত্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধান বেদীর পাশে বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য মানুষের অলিখিত এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। ডাক্তার জনসনের ডায়েরী থেকে আপনি আদিম অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

*　　*　　*

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী

উৎসর্গ ঃ যে প্রেম আমার ভেতর মহৎ ভালবাসার সৃষ্টি করেছে, সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতি-গ্রন্থখানি।

২০শে জুন : ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ মজা লাগল। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও বা দু'চারটে জলের ধারা চোখে পড়ে। ইঁটের রঙের মত জলের রঙ এখানে। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। যে রকম রোদ চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। যীশুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট এক টুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। গুরু-দেহ পাখি যেমন পায়ের ওপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে আমার ইচ্ছের কথাটা জানালাম।

হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার গোড়ার কথা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু এ কথা কেন ?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দিগর্মীতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারী করবে, সে দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়েসের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ ; হাডসন ফরেষ্ট-রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশী।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে শালের বড় বড় পাতার থেকে ভারী ভারী জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোষাকের ওপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল। আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবে গেছে। হাডসন সামনে চলেছেন, আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধিসন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনদিন ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ঐ একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর পাখায় কি উজ্জ্বল

রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। ঐ যে আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল। এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে। দর্শকের দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরী করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য-শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১লা সেপ্টেম্বর ঃ

কয়েকমাস যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ী দেশটা। কুম্‌ডির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপ টপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙ প্রথম দিকে লালচে দেখায়। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি। বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায় না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার নাম 'জনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনী আর সাদা ফুলে তার সর্বাঙ্গ ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। পাশেই

কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শো শো শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির ঢল নেমে আসছে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত উঁচু একটা গৈরিক জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃব্যের বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ী রাস্তাঘাট তৈরী করতে গিয়ে তুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জ্বরজাড়িতে ভোগে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্টে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভও ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর তু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রদ্দুরের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী

হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ্য। কয়েক জোড়া বন মোরগ, তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাত্রে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমরা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয়না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ই নভেম্বর ঃ

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি ?

হাডসন কোন কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেষ্টে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষে আর একটি বড় রকমের লাভের

সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে। তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছেনা, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবেনা।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কি আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ঐ দলের সঙ্গেই আসছেন।

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না ?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুণ হাসির রেখা ফুট উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন।

জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারু জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনদিন ভাবতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ডাক্তার ; তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান ; পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না।

বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোন কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারিনা যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায়-ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোন সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন।

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন !

বললেন, একবার এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডুবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পারা উচিত, বা পারা দরকার ছিল, তা সব সময় পারা যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশী করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যই বিচিত্র

২৫শে নভেম্বর ঃ

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে অবিবাহিতা বোন, ডরোথি।

ছ'জনের বয়সে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতরে কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা। চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একটা একান্ত নির্জন বসবাসের জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য-মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংদাতে একটি চার্চ তৈরী করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাসাংদায় চার্চ তৈরী হল। কাঠের বাড়ী, খড়ের চাল। চার্চের লাগাও আরও কয়েকখানা ঘর উঠল। পাদ্রী পিটার আর

তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। ফুলের জন্যে জমি তৈরী করা হল।

উদ্বোধনের দিন আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংদার চার্চে। সারাদিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল তার। দীক্ষা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

কাজকর্মের জন্যে একটি লোকের দরকার ছিল। তাই চার্চেই রাখা হল মেয়েটিকে।

সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম বাংলোতে।

২৫শে ডিসেম্বর ঃ

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট, ডিসেম্বরের ভেতর সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুম্‌ডির বাংলো থেকে খানিক দূরে থল্‌কোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার-কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্মপথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার

পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি, একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া লাগল, অমনি কি বিচিত্র শব্দ করে ঘুরতে ঘুরতে ওরা নেমে গেল নীচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শাল গাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে, আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্বদেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শাল গাছের মাথার ওপর ঐ তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

কয়েকদিন আগে আমার হাসপাতালে একটি রোগী এসেছে। সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছেনা। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানী। ওর জন্যে এ ক'দিন আমার চোখেও ঘুম নেই।

মনে মনে প্রার্থনা করি, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছেনা, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছান উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিভৃতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর ঃ

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারবনা কোনদিন।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম কুম্‌ডির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে।

এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরী হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোন কোন গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোন গাছে বা ঈষৎ বেগুনী আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকী। শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রঙের ফুল। খাদের ধারে তিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভীড় ভাঙেনি। ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা। ডালের ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা। ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়টার কাছে এসে কোণ তৈরী করে বেঁকে গেছে। এপারের পথ থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিকে

তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নীচেই সাদা সল্ট লিকের একটা রেখা অগভীর ভ্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সল্ট লিক ধরে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটি চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সল্ট লিক ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে এই পাহাড়ী আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ান সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে, চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুজতে লাগলাম। ঐ টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের বোঝা টেনে টেনে আনছিল পশ্চিমের পথটা ধরে। তাদের পেছনে আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চীৎকার করে সাবধান করতে গেলে চিতাটার দৃষ্টি সম্বরের ওপর থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন বিপরীত ফল ফলবে।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক ধাপ লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে আরও ওপরে উঠে আসবে। তখন ঐ লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরুর গাড়ী আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরু দুটো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আয়ত্বে আনবে বলে হেঁই-হো হেঁই-হো করে তাদের পিছু পিছু দৌড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে, অমনি একটি থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চীৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জ্বেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চীৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে আর হৈ চৈ শুনে বাঘটা লোকটাকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক

চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে বয়ে দিয়ে গেল। আজ ক'দিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রহস্যময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি, অথচ কি ভীষণ।

১৫ই মার্চ : ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরী না করে আমি কুম্‌ডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পেঁৗছলাম। গেটের সামনেই পায়চারী করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরী সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

ব্যাপার কি বলুন তো, কোন অঘটন কি ঘটেছে ?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে।

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোন লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সাসাংদার গীর্জায় যেতেন।

তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন।

তুমি জান জনসন, কারো স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনো বাধা দিতে চাই না।

উনি এক ঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কি নিয়ে যেন ওঁর কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন।

ডরোথির কি আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন ?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন।

বললেন, আমি কিন্তু কোনদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা, এটা কি লক্ষ্য করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোন কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ?

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোন সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সন্দেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক। সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষুধ একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে।

ওষুধ তৈরী করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কি বলেন ?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোন ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম

ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজাখুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০শে এপ্রিল :

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে শূণ্য ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন। দেখতে দেখতে ঘন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রঙের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ী ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এল। হলুদ রঙের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। রাতদিন গাছে গাছে চলল তাদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রঙ। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আসর বসল শালের ছায়ায়। মহুয়ার ফুল

কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরী হল সেই ফুলে। তারপর হাড়িয়ার মদে মাতামাতি।

হো সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে সংখ্যায় বেশী। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্প সল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জায়েরা'র আস্তানায় পূজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল, সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর। সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতালেনা, বাড়ীমাতা মাতালেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়ীমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা।'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারু চোখে বা কৌতূহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই। কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে

কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েক দিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি, দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারো হাতে মুরগী, কারো বা পায়রা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কি ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করেছিলাম। লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউএর লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবিনা?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর সারা হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউএর খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোন মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল। এরপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গুঁজতে লাগল। আমি ওদের কাছ থেকে কিছু ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। ফুলদানিতে যে কেউ কখনো ফুল রাখতে পারে, তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ?

অমনি হাসির ঢেউ উঠল।

এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে! দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগী আর পায়রা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল, আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের সারল্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

৫ই মে ঃ

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নদীর তীর ঘেঁষে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এ তো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে নাগরা দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে ?

হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে ক'টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, কয়েকটি নাগরাওয়ালাকে অগুণতি তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ক্রুশ-বিদ্ধ করে রেখে গেছে।

পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন।

বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে ঠিকমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তাহলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী হিসেবে আমাদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার নয় কি?

হাডসনের কথার কোন জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে।

বললাম, ওরা আমাদের এ ধরণের প্রস্তুতিকে কি চোখে দেখেছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খাইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্রে পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে গুয়াতে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশী সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া ওরা অশিক্ষিত। ওদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান খুব সহজ হবে বলে মনে হয় কি?

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তাহলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সজ্ঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনারও বাইরে। তার ওপর আদিবাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সজ্ঘবদ্ধ করছে! সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

কি রকম?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করতেন। আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে দরজা খোলেন। খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলেন না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল, অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন রেবেকা।

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত নিরুপদ্রব হোরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন? কেনই বা

একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায়। কি লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে।

মনে এল সেই হো রাজকুমারীর কথা। এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায়! তার শিখায় একদিন হয়ত সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১২ই মে ঃ

দূর পাহাড়ে আগুন লেগেছে। হাসপাতালের সামনের দাওয়ায় বসে দেখছি। মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে। ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল। তারপর এক সময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে।

কি প্রচণ্ড গরম এ দেশে। ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোন কোন পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশী, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতার রাশে। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে যা কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল।

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজ বেড়ে যায় তখন। দামী গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেদিকে আগুন আসছে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বন-বিভাগের লোকজন লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে। সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে ঐসব শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা

হয়। আগুন ঐ লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলায় এসে নিভে যায়।

এবার যেমন গরম পড়েছে অত্যধিক, তেমনি আগুনও জ্বলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা। বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো কালো চিহ্ন দেখা যায়। আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী দোলায় করে বয়ে নিয়ে এল কয়েকটি ছেলেমেয়ে। আগুনে পুড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম। সবাইকে বাঁচান গেল না। দুটি মারা গেল। তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়, যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করে যেতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে দলে দলে আগুনে-পোড়া রোগী দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল। আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পারা গেল না। এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায়। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরণের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়।

এদের ঘরের মাঝে এক ধরণের উঁচু বেদী আছে। সেই বেদীকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবে রাখে। হোদের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি থাকে তার ভেতর।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

১৭ই জুন ঃ

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার ? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিভ্রাট বাধিয়েছে।

টন্‌শিলটা এত বড় হয়েছে, অপারেশন না করলেই নয়। বম্বেতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মত একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা।

পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তবু তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।'... 'কাছে এসো না আমাদের, এসো না বলছি'।—'চিঠি পাবেনা, কিছুতেই পাবেনা।'...'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরী আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকা হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাদ্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছেনা। কিন্তু চিঠি এল কোত্থেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোন কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার প্রেমপত্র কোনরকমে সংগ্রহ করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানোর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই এক-টুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তাহলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইদানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছ ছাড়া করেনি সেগুলো।

অমনি উঠে গেলাম ভেতরে। ডরোথির হাত ব্যাগ থেকে চাবি

বের করে ওর সুটকেশটা খুললাম। সুটকেশের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোষাক আশাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম। ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠলেন একদিনেই।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম, দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে।

উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে। আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ্য করেছি। আমি আগে আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পেছনে। এবার একটু পিছিয়ে ওঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশি হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্।

রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মত রক্তশূণ্য হয়ে গেলেন।

এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ডাক্তার জনসন। ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা।

চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন ?

নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন।

বললাম, কথা দিন, হাডসনকে ছেড়ে কোনদিন আর পিটারের কাছে যাবেন না।

কতক্ষণ আপন মনে কি ভাবলেন রেবেকা। ছ'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম

না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেলে মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা।

বললেন, আমি জানতে চাইনা কি করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কি যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কি হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে আমি নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেকগুলো স্মৃতি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২২ শে আগষ্ট ঃ

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বন-বিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করে রেখেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা

জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোন চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতরে থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রঙের রদ্দুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর থেকে রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ী ঝোরার ধারে ঐ যে বসে আছে ধনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে গেল আকাশী রঙ। পথে পথে বন যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কি মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্তের ভেতর বর্ষার জল জমে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধ হয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর থেকে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে লেহন করতে লাগল। এত

স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে আর নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য পথ ধরি। এমনি ভাবে চলতে চলতে একসময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার ওপরে উঠলাম; যদি এর ওপর থেকে কোনরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীলে সবুজে মেশা পর্বত তরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কি অপরূপ সৌন্দর্য ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তে দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কি যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোথা থেকে! ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গটি বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে তা বোঝা গেল না; কারণ, মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড়

আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ হো সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভেতর যে ধরণের গড়ন দেখেছি, তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল রয়েছে, তবু আদিবাসী হো দের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোন শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা ভুলে, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি ?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি।

আস্তানা বরাইবুরু না কুম্‌ডির বাংলোতে ?

বললাম, ও দুটোর কোনটাতেই নয়।

তবে ? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, থলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন !

কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানলো কি করে !

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, অনেক দূরে এসে পড়েছেন ডাক্তার জনসন, তাছাড়া এই ছোট নাগরা এলাকাটাও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়। আসুন, আপনার পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা, উঁচুনীচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল, আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, ছুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসঙ্কট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ্য রেখে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই ছুর্গম স্থানটি পার হলাম।

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া ছুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ওপরের পথ ছেড়ে নীচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পৌঁছলাম। পার হতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ অবধি জলে ডুবল।

আমরা ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে পার হলাম, তাই পোষাক কোনরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুম্‌ডির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই। সেবা করার জন্যেই আমাদের ডাক্তারী শিক্ষা।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণ। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষবারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশাকরি আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে মুখে রটবেনা।

বললাম, ডাক্তার জনসন আশাকরি অকৃতজ্ঞ নয়।

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ফিরে চললাম কুম্‌ডির বাংলো লক্ষ্য করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও

দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমার বিশেষ কোন অসুবিধেয় পড়তে হল না। কুম্‌ডির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার চিন্তায় কেবল একটি কথা আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেরেছে কি!

১৯শে ডিসেম্বর ঃ

প্রথমে সাসাংদা গীর্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরী গীর্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল ছাতমবুরুতে। হোদের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ঐ পাহাড়ে সেখানে সরকার লোহার সন্ধান পেয়েছিল, সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতমবুরুকে। বসল সেখানে সশস্ত্র রক্ষীদল।

হোদের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনে কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গীর্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোন রকম আক্রমণ করা হল না। তাঁরা কুম্‌ডির-ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। হার মানলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গীর্জা

তৈরীর কাজ শুরু হল। কয়েকদিনের ভেতর নতুন ছাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর দলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরী হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী-বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের তেতর যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল সাসাংদার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয়ে না থাকলে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী পুলিশ সাসাংদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। কিন্তু কোনদিক থেকেই কোনরকম সাড়া পাওয়া গেল না।

কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হো, লোহার, মুণ্ডারী, সাঁওতাল সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ঐ একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছু করাই সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারিয়া। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারো কাছে তার কথা বলতে পারলাম না।

আবার খবর পেলাম সাসাংদার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের একটি কুটিরও অক্ষত নেই। এত কড়া পাহারার ভেতর কি করে এমন কাণ্ড ঘটল, তা ভেবে প্রথমে বিস্মিত হলাম। পরে শুনলাম, মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারাদার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে সমস্ত গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জ্বেলে বহু দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ্য করে ঘেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারো মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সাময়িক কয়েদখানা। দলে দলে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা ধরণের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

শুনলাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোক এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোন সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর সূঁচ ঢুকিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরণের নির্দয় অত্যাচারের ভেতর যে পশু মনোবৃত্তি আছে, আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি, আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি।

সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপযাচক হয়ে এসেছিল ইনফরমারের কাজ করবে বলে। তারই নির্দেশমত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশিত পথে এসে পৌঁছল একটি পাহাড়ী নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাঁটির দূরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই

মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সব ক'টিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতিপক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরণের আচরণ এদের বিধানে আছে, তার সব ক'টিরই পরীক্ষা করতে লাগল এরা।

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তার স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে উঠে আসার সময় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে। আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশ্যে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯০০

একটি খবর শোনা গেল। উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্দা বনের দিকে। হাতে তাদের তীর ধনু আর টাঙি। সরকারী গুমটির টহলদারী দু'জন পুলিশ তাদের দেখতে পেয়েছিল, গতিরোধের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এক রাত বন্দী থেকে তারা ফিরে এসেছে। তাদের মুখে শোনা গেল এক রহস্যজনক কাহিনী। একটি অশ্বারোহিণী মেয়ে, হাতে

তলোয়ার নিয়ে পরিচালনা করছে সমস্ত দলটিকে। গভীর পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে দলে দলে তারা এগিয়ে আসছে। রাতে মশাল জ্বেলে চলেছে তারা। দিনের বেলা ঘন বনের ভেতর আত্মগোপন করছে। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে টহলদারী পুলিশেরা বন্দী হয়েছিল।

এক রাত তাদের নাকি কাটাতে হয়েছিল ঐ আদিবাসীদের সঙ্গে। বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের নেত্রীর নির্দেশে তারা সকলে মিলে প্রার্থনা করে। তারপর নেত্রী তাদের সামনে আদিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে, তাদের একতা সম্বন্ধে কথা বলে যায়। সে কথা নাকি আদিবাসীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে। প্রাণ দিয়েও নেত্রীর অনুগত থাকবে বলে তারা প্রতীজ্ঞা করে।

সবশেষে শুরু হয় নাচ আর গানেব আসর। দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের মন যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্যে এই ব্যবস্থা। মণ্ডলের মাঝে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেত্রী। তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নৃত্য আর গীত। সে এক বিশেষ উপভোগ্য দৃশ্য। টহলদার পুলিশের সামনেও এমনি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছে। তারপর নেত্রী পুলিশদের বলেছে, তোমরা এ দেশের মানুষ হয়ে কেন এমন শত্রুতা করছ আমাদের সঙ্গে। জানি, নিমক খেয়েছ, কিন্তু নিজের দেশের মাটি আর মানুষকে রক্ষা করা কি তার চেয়েও বড় কর্তব্য নয়।

পরের দিন সকালে অবশ্য তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসার সময়ে নেত্রী বলে দিয়েছে, সরকারকে প্রস্তুত থাকতে বলো। আমাদের দেশের এই সরল মানুষগুলি সহজে তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না।

বসে বসে ভাবছি, এ নিশ্চয়ই সেই অরণ্য-কন্যা, যার ক্ষণিক সঙ্গ আমি পেয়েছিলাম। সেদিন তার চোখে মুখে যে দীপ্তি, যে পরোপকার ব্রত দেখেছি, আজ মনে মনে তাই আর একবার স্মরণ করলাম। নেত্রী হবার উপযুক্তই বটে। কিন্তু কোথায় ছিল এ অরণ্য-অগ্নি। যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তাদের ভেতর এ স্ফুলিঙ্গ তো কোনদিন দেখিনি।

হয়ত এমনি হয়। যখন মানুষ অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

তারা আঘাত হানবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেদিন তাদের পরিচালনা করবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় উপযুক্ত কোন চালক।

জোয়ান অব আর্কের কথা মনে পড়ল। আমাদের জাতির মানুষ যখন পর-রাজ্যের লোভে এগিয়েছে, তখনই নিপীড়িত মানুষের থেকে জেগে উঠেছে মহিয়সী মহিলা জোয়ান।

আজ আমার চোখের ওপর নতুন এক জোয়ানের আবির্ভাবের ছবি ফুটে উঠছে। জোয়ানকে যে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছিল, দেখছি সেই অগ্নি থেকেই যেন শাণিত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আর এক অগ্নি-কন্যা। আমি ভয় পেলাম না। আমার জাতির অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনে মনে তাকে স্বাগত জানালাম।

১৭ ই মে ঃ

এবার হাডসন বরাইবুরুর হেড কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ, গ্রীষ্মকালে বনে বনে

যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোন চেষ্টাই করা হবে না; বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেড কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারলনা। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাত দিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশীদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার; রোগী এলে তাদের ফেরান আমার সাধারণ সেবাধর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কর্তৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোন আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তাহলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুবই আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোন কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাম, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ী গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

শেষ পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতে ঘোড়ায় চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চল গুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত। পথের হিংস্র পশুর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না।

এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, সরকারী আগুনে পোড়া কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল প্রায় দিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এসেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটি আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন করে সে বলল, ডাক্তার জনসন, যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তাহলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটির কথায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে এমন কোন মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার হাতের লেখা পেসক্রিপসন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোন রকমে না পড়ে।

লোকটি আমার প্রেসক্রিপসন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এর পর আপনার চিকিৎসার কোন অসুবিধে হবেনা।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ীর। হয়ত কোন সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দরদী এই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোন অসুবিধেই হল না।

১৫ই আগষ্ট ঃ

এবার বর্ষায় লড়াই চরমে পৌঁছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরী করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরী করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইএর জন্য সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেলনা।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধনু, টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন ঘাঁটি লক্ষ্য করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিলে। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি করল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খবর এল, হাজার হাজার আদিবাসী যোদ্ধা চলেছে ছাতমবুরুর দিকে। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গাকে উদ্ধার করতে হবে শত্রুর হাত থেকে। তারা গভীর জঙ্গল, দুর্গম গিরিখাদ, সব কিছু পার হয়ে চলেছে। মেয়েরা চলেছে আগে আগে। তাদের মাথায় কলস। পূজার উপচার হাতে। দেবস্থান উদ্ধার হলে তারা পূজা দেবে দেবতার উদ্দেশ্যে।

বরাইবুরুর ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হল। তারা ঘোড়ায় চড়ে চলল ছাতমবুরুর দিকে। ওখানে যে সব রক্ষী রয়েছে, তাদের দলবৃদ্ধি করাই এদের উদ্দেশ্য।

আদিবাসীরা দুর্গম পথ দিয়ে চলেছে, আর এরা চলেছে বাঁধান পথের ওপর দিয়ে। কিন্তু পদে পদে বাধা। সরকারী পথ যেখানে

সেখানে আদিবাসীরা ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা পথে কোথাও কোথাও বয়ে চলেছে বর্ষার খর জলস্রোত।

সরকারী পুলিশেরা ছাতমবুরুর কাছাকাছি এসেই বিপদের সম্মুখীন হল। শাল আর শিমূলের ঘন বনের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের ওপর শুরু হল তীর বৃষ্টি। ঘোড়া সমেত আরোহীরা এই অসতর্ক আক্রমণে ছিট্‌কে পড়ল ডানদিকের গভীর খাদে। তাদের ভেতর অতি অল্পই পৌঁছল ছাতমবুরুর বেস-ক্যাম্পে।

তখন গভীর রাত। ছাতমবুরু পাহাড়ে ওঠার পথে সারি সারি সান্ত্রী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খবর পাওয়া গেছে আজই আদিবাসীরা ছাতমবুরু আক্রমণ করবে।

বেস ক্যাম্পে কারো চোখে ঘুম নেই। বয় বেয়ারাগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে আছে। কীট পতঙ্গ রাতের অন্ধকার চিরে চিরে শব্দ করছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে দু'একটা হিংস্র জন্তুর। কিন্তু এ সকল উদ্বেগ আজ কারো মনে কোন রেখাপাত করছে না। আসন্ন একটা বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই।

পাহাড়ে ওঠার এই একমাত্র পথ। অন্য দিকগুলো ভয়ানক খাড়াই, আর গভীর জঙ্গলে পূর্ণ।

বেস ক্যাম্পে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে ওৎ পেতে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করছে শত্রুর আগমনের। রাত তখন প্রায় দুটো।

হঠাৎ মনে হল চারদিক কাঁপিয়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ছাতম-বুরুর পাহাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নীচে খসে পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল পালাও পালাও শব্দ। চারদিকে আতঙ্ক। গভীর অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। পাথর এসে পড়ছে ক্যাম্পের ওপর। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সব। চীৎকার উঠছে।

মানুষের আর্ত্ত চীৎকার। কে কোথায় পাথরের তলায় চাপা পড়েছে, তার গোঙানি উঠেছে।

আহত ঘোড়াগুলো বীভৎস আর্তনাদ করছে।

যারা কোন রকমে বনের আড়ালে থেকে বেঁচে গেল, তারা সভয়ে দেখল একটা, দুটো করে শত শত মশাল জ্বলে উঠছে ছাতমবুরুর পাহাড়ের ওপর। নাগরার আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারপর পঙ্গপালের মত দলে দলে বেস ক্যাম্পের পাশ দিয়ে উঠে যেতে লাগল আদিবাসীর দল। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গার জয় ধ্বনি দিতে দিতে তারা উঠে চলল ওপরে।

আদিবাসীরা সেই রাতে অধিকার করে নিল ছাতমবুরুর পাহাড়। সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির মুক্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ইনফরমারের মুখে খবর পাওয়া গেল। দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের যে দিকটাতে পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেই পথে কতকগুলো আদিবাসী আগের রাতে কাঁধে কাঁধে ভর দিয়ে ত্রিভূজের মত ওপরে উঠেছে। তারপর দড়ির সাহায্যে টেনে টেনে তুলেছে অন্যান্য সঙ্গীদের। তারা ওপরের পাহাড়ে শিলাখণ্ড আর নুড়িগুলোকে একত্র জড়ো করেছে।

সারাদিন এই কাজ করার পর, গভীর রাতে বেস ক্যাম্প লক্ষ্য করে ছেড়ে দিয়েছে সেই সব পাথরের বড় ছোট চাঁইগুলো। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। যখন বেস ক্যাম্পের লোকেরা আহত হয়ে এদিকে ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পাহাড়ের ওপর মশাল জ্বেলে আদিবাসীরা নাগরায় আওয়াজ তুলেছে। নীচে জঙ্গলের আড়ালে অপেক্ষমান হাজার হাজার আদিবাসী সেই শব্দে উল্লাস ধ্বনি করতে করতে উঠে গেছে ওপরে।

বর্ষায় ছাতমবুরু পুনরধিকার অসম্ভব। চেষ্টা করতে যাবার অর্থই হল অযথা অজস্র লোকক্ষয়। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। বরাইবুরুর দিকেও নাকি এগিয়ে আসছে আদিবাসী দাঙ্গাকারীরা। বরাইবুরু অবশ্য সুরক্ষিত। সেখানে জঙ্গলের অংশ কম। অনেক-খানি সমতল জুড়ে কয়েকশ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রেয়েছে সব সময়।

কুম্‌ডির বাংলো থেকে রেবেকা আর ডরোথিকে হাডসন বরাই-বুরু পাঠাতে পারতেন, কিন্তু কি মনে করে থলকোবাদে আমার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

আমার হাসপাতালে আমি একটি সান্ত্রীকেও থাকতে দিইনি। তবু হাডসন আমার আস্তানাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবলেন।

রেবেকা আর ডরোথি এল। দেখলাম, ইতিমধ্যে দু'বোনের খুব ভাব হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সারাদিন সমানে চলল ওদের রসিকতা।

ডরোথির সঙ্গে আমার নামের যোগ করে কথা বলতে ভালবাসে রেবেকা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই কৌতুকময়ী মেয়েটি আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে রেবেকা বিষন্ন হয়ে যান। জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানান হাডসন সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা। যে রকম এক রোখা মানুষ, না জানি এইসব হাঙ্গামার দিনে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

ডরোথির বিষন্নতা কিন্তু অন্য দিকের। রাতের আঁধার নামলেই সে চারদিকের দরজা, জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। তার কেবলই ভয়, এই বুঝি বুনো মানুষগুলো হাসপাতাল ঘেরাও করে তাকে ধরে ফেলল।

যত বুঝাই, আর সব জায়গায় গেলেও আদিবাসীরা এখানে

আসবে না, ততই ডরোথি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, বন্নাইবুরুতে যেতে পারলে সব চেয়ে খুশি হত সে।

এদিক থেকে আমি তাকে খুশি করতে পারলাম না ঠিক, কিন্তু আর এক দিক থেকে সে কেমন এক আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

রেবেকা যখন আমার সঙ্গে ডরোথিকে জড়িয়ে কৌতুক করেন, তখন ডরোথি খুশি হয়।

সেদিন হাসপাতালে রোগী দেখে কোয়ার্টারে ফিরে ডরোথিকে দেখলাম না। রেবেকা উঠোনে বসে কি যেন একটা বুনছিলেন।

ক'দিন একটানা বৃষ্টি হবার পর সবে এক চিলতে রোদ দেখা দিয়েছে। চারদিক সেই করুণ আলোর প্রসন্ন ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভারী উপভোগ্য মনে হচ্ছিল এই দৃশ্যটুকু। আমি হাসপাতালের পাশের পাহাড়ে উঠে এলাম। এখানে একটি ঝর্ণার ধারে কয়েকটি শালগাছ ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় একটি মসৃণ পাথর। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই বসতাম।

পাহাড়ে উঠে দেখি, ঝর্ণার ধারে ঐ পাথরটার ওপর ডরোথি বসে আপন মনে গান করছে। আমি তার পেছনে ছিলাম, তাই সে আমাকে দেখতে পায়নি।

সামনে শালগাছে দড়ি বাঁধা। তার থেকে ঝুলছে আমার সদ্য ধোয়া পোষাকগুলো।

আমি পাহাড়ের আড়ালে থেকে ঝর্ণার জলে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারলাম। ডরোথি চমকে শিলা স্তূপটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতে লাগল। আবার একটা পাথর ছুঁড়লাম। শালগাছের কাণ্ডে লেগে সেটা পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে চলল। এমন ভয়ের চেহারা আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

ডরোথি ভয়ে কাঁপতে লাগল। আমি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ও প্রায় চীৎকার করতে যাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখে দৌড়ে এসে ভয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

যত বোঝাবার চেষ্টা করি, ততই সে ভয় পেয়ে আমাকে জড়ায়। যখন বললাম, আমিই পাথর ছুঁড়েছি, তখন ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, আমাকে কুম্‌ডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না।

সেদিন তাকে শান্ত করতে অনেক সময় কেটে গেল আমার।

পরে মুখে কয়েকবার বললেও, থলকোবাদ ছেড়ে ও আর কোথাও যেতে চাইল না।

একদিন হাডসন এলেন হাসপাতালে। তাঁর মুখেই শুনলাম, এখন হাঙ্গামা একটু কমেছে।

হাডসন বললেন, যদি এর পর বৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের সুবিধে হয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টার থেকে ফৌজ আনিয়ে তখন বুনোগুলোকে শায়েস্তা করার আর কোন অসুবিধেই হবে না।

হাডসন, রেবেকা আর ডরোথিকে কুম্‌ডিতে নিয়ে গেলেন। ডরোথির এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল, সেটা সে আমার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশও করেছিল, কিন্তু রেবেকাই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন খোস গল্পের মাঝে ভাটা পড়তেই আমি বুঝলাম, কোথায় যেন কি একটা আনন্দের সূতোয় টান পড়েছে। নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা। যে ভাবে বর্ষার শুরু হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বর্ষার দিনে আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন ভাঙা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনিয়ে রাখা হল। এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সমানে। শেষে হট্‌তে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ্য করছিলাম। লড়াইএ যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য আরও বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না। অকারণ লোকক্ষয়ের থেকে সরে দাঁড়াল তারা। লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যাঁর, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

১৭ই ডিসেম্বর ঃ

বিধাতা সত্যই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারিদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না এককণা। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েক মাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল, ছাতমবুরুতে সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের

কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করবে সরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারিয়ার সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জল-স্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ভেঙে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরণের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের একজনের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল। সেই হল সরকার পক্ষের ইনফরমার।

ছোটনাগরার উপত্যকায় সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই নাকি বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশবাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। তারা সেই ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশী সময় লাগল না।

গুপ্তঘাঁটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী সেই রহস্যময়ী রমণী, কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভু যীশুর কাছে কেন জানিনা নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারিয়ার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

১৩ই জানুয়ারী ঃ ১৯০১

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজ শুনলাম হাডসনের মুখে। কথাটা শুনে এদেশের মেয়েদের ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল।

হাডসন যখন কথা বলছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর গলায় আফশোসের সুরই বাজছিল। মেয়েটি মারা গিয়ে নাকি সবকিছু ভেস্তে দিয়ে গেল। নইলে শনিচারিয়ার খবর তার কাছ থেকে যে কোন রকমেই হোক আদায় করা যেত।

ঘটনাটি এইরূপ ঃ

একদিন একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। যেখানে আদিবাসীদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, সেখানে সে গেল না। সে পুলিশ অফিসারদের কাছে এসে কেঁদে কেটে অস্থির করে তুলল।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, সে তার হারান স্বামীকে খুঁজছে। মেয়েটি কথা বলে আর কাঁদে।

কতদিন নাকি তার স্বামী তাকে ছেড়ে এসেছে। সে খেতে পরতে না পাক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু একা ঘরে সে কাটাবে কেমন করে। সেই যে কতদিন আগে ক্যাম্পে আসছি বলে এলো, আর ফিরে গেল না। রাত দিন সে চোখের জলে ভাসছে।

শনিচারিয়া মেয়েটা মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। সে বলে, তার স্বামী নাকি সরকারের কাছে ছোট নাগরা দুর্গের খবর দিয়েছে।

শনিচারিয়া তাকে মেরে ফেলবে বলে শাসায়।

মেয়েটার কাছে এতগুলো খবর পেয়ে বরাইবুরুর ক্যাম্প ইনচার্জ চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার তাহলে শনিচারিয়াকে ধরা যাবে।

ক্যাম্প ইনচার্জ মেয়েটিকে এবার শনিচারিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু মেয়েটি আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। সে আগে তার স্বামীকে দেখবে তারপর অন্য কথা। কতদিন সে তার স্বামীকে দেখেনি।

মেয়েটির স্বামী যথার্থই ইনফরমারের কাজ করেছিল। লোকটি যে ক্যাম্পে ছিল, মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।

সে কি কান্না তার। কত অভিমান। স্বামী লোকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে থামাতে পারে না।

কি করেই বা সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। শনিচারিয়া একবার তার সন্ধান পেলে আর আস্ত রাখবে না। সে সরকারে ছোট-নাগরার খবর দিয়েছে। এর পরে তার আর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলে না।

মেয়েটি সব শুনল। ধীরে ধীরে তাদের মান অভিমানের পালা কাটলো। সে সারাদিন রইল তার স্বামীর কাছে। ক্যাম্প-ইনচার্জ তাদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। একটু শান্ত হলে মেয়েটার কাছ থেকে অনেক সন্ধানই পাওয়া যাবে। এখন আদিবাসীরা শান্ত হয়েছে ; কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা চলে না। দুর্ভিক্ষ কেটে গেলেই তারা শনিচারিয়ার নেতৃত্বে আবার রুখে দাঁড়াতে পারে। অতএব সবার আগে চাই শনিচারিয়ার সন্ধান।

ইনচার্জ মনে মনে পুলকিত হল।

একরাত স্বামী-স্ত্রী কাটাল ক্যাম্পে। শেষ রাতে একটা প্রাণ-ফাটান আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই দৌড়ল সেদিকে। ইনফরমারের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের মেয়েটা অট্টহাসি হাসছে। হাতে তার একখানা রক্তাক্ত ছোরা।

তাকে ধরতে যেতেই সে হাতের ছোরাখানা নিজের বুকে সজোরে গেঁথে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বলে গেল,

দেশের শত্তুর, বেইমানের সাজা সে দিয়েছে। আর কিছুই চায়না সে। আজ তার সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন।

হাডসনের মুখে কথাটা শুনে সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের স্বামীকে খুন করল মেয়েটি দেশের জন্যে!

আমি মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম সেই রহস্যময়ী অরণ্য-কন্যাকে, যে এই অশিক্ষিতা মেয়েটির মনেও দেশকে ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২৩শে মার্চ ঃ

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোণা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটা উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রকমের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাখায় জড়ান।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে

সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারিয়া।

আমি কোন কিছু বলার আগেই শনিচারিয়ার মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোষাকের দিকে।

একি, তোমার পোষাক যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ওকে ধরে ফেললাম।

শনিচারিয়া বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বসন্তের রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, শিগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনা ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকী রইলনা।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারিয়া বলল, তাহলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে। পরে তোমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আমার ডিসপেনসিং রুমে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল, অল্প সময়ের ভেতর গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা দেবে, এ যে একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমনি অভাবিত বস্তু কখনো কখনো আমাদের হাতের কাছে এসে যায়। তখন মনে হয় সমস্ত ঘটনাটি যেন অলীক একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘটে যাচ্ছে।

সারারাত ঘুমল ও, আমি পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। ছুরিতে ডিসেক্সন করে যা দেখা যায় না কোনদিন, ওর সেই শক্তি আর শ্রীকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভোরের কাছাকাছি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল, বাইরে কাদের গলার আওয়াজে উঠে বসলাম।

দেখি, আমার আগেই শনিচারিয়া উঠে বসেছে। ওকে ইসারায় কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক আগেই ভোর হয়ে গেছে। চারদিক রদ্দুরে ঝলমল করছে। হাসপাতালের সামনের পথে দেখি দুটি অশ্বারোহী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

মুখোমুখি হতেই ওরা আমাকে অভিবাদন জানাল।

একজন বলল, ডাক্তার জনসন, কাল রাতে কি আপনি কোন স্ত্রীলোককে এ পথে যেতে দেখেছেন ?

আমি বিস্ময়ের ভাণ করলাম, এ পথ দিয়ে চলে যেতে, কই না তো !

ওরা আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি সুবাদার সাহেব ? আসুন, চা পান করা যাক।

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বসল হাসপাতালের বারান্দায়।

বামিয়াকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

বামিয়া আদিবাসী একটি ছেলে। গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে আসে। ভাল হয়ে ও আর গাঁয়ে ফেরে না, আমার কাছেই থেকে যায়। হাসপাতালের ফরমায়েস খাটে বামিয়া।

হেসে বললাম, হঠাৎ ভোরবেলা স্ত্রীলোকের খোঁজ কেন সুবাদার সাহেব ?

আর বলেন কেন ডাক্তার সাব, ঐ মেয়েটার জন্যে আমাদের দিনে রাতে ঘুম নেই।

কোন মেয়ে আবার ?

ঐ যে ডাকু মেয়েটা, যে আদিবাসী জানোয়ারগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

বললাম, তার জন্যে আপনাদের ঘুমের কামাই হবে কেন ?

ওকে ধরতে না পারলে সোয়াস্তি নেই। বাইরে থাকলেই আবার জ্বালাবে। কোন দিক থেকে যে কি করে বসবে বলা যায় না।

বললাম, সামান্য একটা মেয়ে, তার এত দাপট। এতগুলি ঝানু জাঁদরেল পুলিশকে ভাবিয়ে তুলল !

আত্মসম্মানে মনে হল ঘা লেগেছে সুবাদার সাহেবের।

বলল, সামান্য মেয়ে হলে কি আর ধরতে সময় লাগে ডাক্তার সাব। এ মেয়েকে আপনি দেখেননি, তাই এমন কথা বলছেন।

আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

তা আর দেখিনি। ছাতমবুরুতে লড়াই হল, সে কি মূর্ত্তি তার। ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলক পড়তে না পড়তে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে বেশ দক্ষ বলতে হয়।

দক্ষ বইকি। শেষে লড়াইএ হঠে গিয়ে যে পথ দিয়ে ওদের লোকজন নিয়ে নেবে গেল, আমরা তা কোনদিন ভাবতে পারতাম না।

কোন রকমে পাকড়াও করতে পারলেন না ওকে ?

চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু দেখতে না দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

চা নিয়ে এল বামিয়া। ওদের চা আর কেক খাওয়ালাম। খুব খুশি।

বলল, একটা কথা বলি ডাক্তার সাব, যদি কিছু মনে না করেন।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এরা আবার কি কথা বলতে চায়।

মুখে বললাম, আপনারা কোনো সংকোচ না রেখেই কথা বলুন। আমি কিছুমাত্র মনে করব না।

ওদের একজন বলল, পুলিশ ব্যারাকের অফিসাররা মনে করেন, আদিবাসীদের ওপর আপনার নাকি একটু দরদ আছে।

বললাম, নিজের নিজের কাজের ওপর আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমি ডাক্তার, আমার কাছে রোগীর কোন জাত ধর্ম নেই।

ওরা দুজনেই আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

খাওয়ার শেষে উঠল ওরা।

বললাম, সেই মেয়েটিকে কাল রাতে দেখার কথা কি যেন বলছিলেন ?

হাঁ, আমরা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের ভ্যালিটার ঐ প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাকে স্পষ্ট দেখলেন ?

চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায়। আর দেখুন, এ দেশে ঐ একটি ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে কেউ কখনো ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি।

তারপর কি হল ?

গুলি ছুড়লাম ওকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তে বনের ভেতর মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাহলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ বন ছেড়ে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর পালিয়েছে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে ওদের পাঁচ হাজার টাকার শিকারের লোভে বনের দিকে দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে। এসে দেখি বিছানায় উঠে বসে শনিচারিয়া বামিয়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বামিয়া লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। শনিচারিয়া সে দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির।

কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম, ও আমাকে ভয় করে।

হাসি আর থামতেই চায় না শনিচারিয়ার।

আমার চেয়েও বেশী ভয় ওর ?

বললাম, কে তোমাকে বসতে হুকুম দিয়েছে, জান, এটা হাসপাতাল। এখানে একমাত্র আমার আদেশই পালন করা হবে।

মুহূর্তে ওর হাসি থেমে গেল। চোখমুখে অসহায় অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। পাটা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

হাসি চাপতে চাপতে বাইরে এলাম।

বামিয়াকে বললাম, খাবার দিয়ে এস ভেতরে। আর একটা কথা, ও যে এখানে আছে কেউ যেন না জানে।

বামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চৌদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষ মাত্রেই সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানিনা বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারিয়ার কথাই ভাবতে লাগলাম।

কি তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কি বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানান কথা। বামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারিয়ার সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি, কেবল কেঁদে চলেছে!

বামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারিয়ার কাছে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে শনিচারিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাষ্টের সময় হয়ে গেছে কখন, কেক আর দুধটুকু খেয়ে নাও। গায়ে বল না এলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান। কোন কোন আদিবাসী খাওয়া

দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারিয়া আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, ওটা বামিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে।

মুহূর্তে কি যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝনা ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে বলতে, তাহলে খেতে না চাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি ?

খেতে খেতে খাওয়া থেমে গেল।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারিয়া।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা।

জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে, তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারিয়ার ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারিয়া। তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারিয়ার মুখে কেমন যেন ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সেরে উঠে কি হবে ডাক্তার, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা বলছ কেন ?

কোন দিক থেকে মানুষ যখন সফল হতে পারে না, তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে শনিচারিয়া।

আমাকে স্বার্থপর ভেবোনা ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে।

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এল ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবাদারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারিয়া। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারো কাছে তোমাকে তুলে দিতে মন চায় না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কোন কথা বলল না।

আমি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারিয়ার সঙ্গে। এ ক'দিনেই বুঝতে পেরেছি কি বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সামনের উপত্যকা আর তার ওপারের বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোন কোন দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারিয়ার জীবনের কথা।

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোটনাগরা দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বলল, বাবা ছিলেন আদিবাসী হো সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলা খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিংএর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিংএর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবা সেখানে অভিরাম সিংএর আস্তাবলে কাজ করতেন। কালে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। বিয়ে করবেন বলে উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার খানা টেনে নিয়ে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর একটি হাত দু'খণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্য। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই তিনি ফিরে আসেন।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিংএর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে নানা কৌশলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা। বিয়ে হল দুজনের। ছোট নাগরায় বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মাহালের প্রায় সমস্ত হোদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের দীক্ষা দিলেন জাতীয়তার মন্ত্রে।

বাবা বলতেন, নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে। ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না।

জঙ্গলের লোকে বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের তদারকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারিয়া। একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল তার চোখেমুখে।

কিছুক্ষণের ভেতর নিজেকে সংযত করে ও আবার কথা শুরু করল।

প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোট নাগরার দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা, মা চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

ও প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ।

আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জংলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারিয়া। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারিয়া। আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম, তা আর হল না। শনিচারিয়াকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রি দিন ঘুরে বেড়ানই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারিয়া হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারব ডাক্তার ?

বুঝিয়ে বলতাম, আঘাতটা গুরুতর, তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত । চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁইএর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল একসময়।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারিয়া কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার জলে ধোয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা শোনাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারিয়া বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি।

ও অমনি বলত, তোমার ধর্ম একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় জনসন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা হল শনিচারিয়া।

ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত, প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক

একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের জিনিষ। আমার মনে হয় কি জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারিয়ার কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মন অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হতে লাগল।

শনিচারিয়ার মনের বিপুল ঐশ্বর্যের ভেতর আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল।

বললাম, ডাক্তার হয়ে বলব, তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক্, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে ক'টি দিন ও হাসপাতালে বন্দী হয়ে থাকে সে ক'টি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। বলল, খাঁচার ভেরত যে পাখি কিছুকাল বন্দী হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার?

হেসে বললাম, বুনো পাখীরা বড় একটা পোষ মানে না। খাঁচার ভেতর থেকে তারা কেবল পালাবার জন্যে পাখা ঝাপটায়।

হেসে ফেলল শনিচারিয়া। তারপর হঠাৎ মুখে ভাবনার ছায়া নামল ওর। অনেকক্ষণ বসে বসে আপন মনে চিন্তার জাল বুনে

চলল। আমি যে এতক্ষণ তার পাশেই বসে আছি, সে খেয়ালই নেই তার।

একসময় দেখলাম, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শনিচারিয়ার। কি একটা ভাবনার দীপ্তিতে সে যেন ঝলমল করছে।

আচ্ছা ডাক্তার, রবার্ট ব্রুস খুব বড় সাধক ছিলেন, তাই না?

তিনি বীর ছিলেন।

না ডাক্তার, যত বড় বীর ছিলেন, তার চেয়ে সাধক ছিলেন অনেক বড়। হেরে গিয়েও তিনি হার মানেননি, চেষ্টা করে গেছেন বারবার।

বললাম, তুমিও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হতে পারবে।

ও আমার দুটো হাত চেপে ধরল।

তুমি বলছ ডাক্তার, আমি পারব। ওদের আবার আমি জাগিয়ে তুলতে পারব।

বললাম, নিশ্চয় পারবে তুমি। সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি দেখেছি তোমার দেশের সেই মেয়েটিকে যে দেশের জন্যে নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে।

শনিচারিয়া চমকে উঠল বলে মনে হল।

তুমি জান ডাক্তার, সে মেয়েটির কি হয়েছে?

স্বামীকে খুন করে সে নিজের বুকেও ছোরা বসিয়েছে।

দুটি হাত জোড় করে শনিচারিয়া প্রার্থনা করল। চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জলের ধারা।

একসময় শান্ত হয়ে বলল, তোমাদের সরকারের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হয়নি, আমি কত সুখী হয়েছি তার মৃত্যুতে, সে তুমি বুঝবেনা ডাক্তার।

একটু থেমে মনে মনে কি যেন ভাবল ও। তারপর বলল,

সোনিয়া মারা গিয়ে আমার একখানা হাত ভেঙে দিয়ে গেছে ডাক্তার।

বললাম, মেয়েটির আচরণ দেখে ও যে তোমারই লোক তা বোঝা গিয়েছিল।

শনিচারিয়া বলল, তোমাদের চার্চে সোনিয়া আর তার স্বামী দীক্ষা নিয়েছিল। আমি ঐ মেয়েটিকে কি যে ভালবাসতাম। আমার কাছ থেকে ও বিদেশী সাহিত্যের বই নিয়ে পাড়াশোনা করত।

একটু অবাক হয়েই বললাম, সোনিয়া শিক্ষিতা মেয়ে!

তোমরা শিক্ষিতা কাকে বল জানিনা, তবে সোনিয়া শুধু পড়াশোনার শিক্ষা পায়নি, দেশের জন্যে নিজের স্বামীর প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই করেছে।

জান ডাক্তার, ওর স্বামী ছিল একেবারে অশিক্ষিত। কিন্তু কি সেবাই না সোনিয়া তাকে করত। যেদিন শুনল, ওরই স্বামী সরকারের ইনফরমার হয়েছে, সেদিন ও আমার কাছে এসে বলল, ওর প্রায়শ্চিত্তের ভার আমার হাতে তুলে দাও শনিচারিয়া।

বললাম, দেশ আমাদের সবার চেয়ে বড়, শুধু এই কথাটুকু মনে রেখ।

সে কথা সে মনে রেখেছিল। তাই ভাবি ডাক্তার, আবার আমি হয়ত দাঁড়াতে পারব।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকেনা, মানুষের দুর্বলতাও চিরদিনের নয়।

আচ্ছা ডাক্তার, তোমার হাতে কি এমন ক্ষমতা নেই যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারি।

কথাটা আঘাত করল আমার মনে। বললাম, তুমি কি মনে

কর, ডাক্তার তার রোগ সারাবার ক্ষমতা গুলো হাতের ভেতর রেখে দিয়ে চিকিৎসা করে!

ওর মাথাটা নত হল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। নিজের মনের উত্তেজনায় তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, আমার কাছে দেশ নেই, জাতি নেই। আমি শুধু মানুষকে ভালবাসি। তাকে সারিয়ে তোলাই আমার একমাত্র ব্রত। এখানে শনিচারিয়ার সঙ্গে হাডসনের কোন ভেদ নেই।

তুমি মানুষকে ভালবাস, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি ডাক্তার জনসন।

আমার হাসপাতাল দেখার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই হেসে বললাম, একজন রোগীর কাছে এত সময় দিলে বাকী রোগীদের ওপর অবিচার করা হবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, শনিচারিয়া হঠাৎ হাত ধরে টেনে বসাল।

রোগ গুরুতর হলে রোগীর কাছে বেশী সময় দিতে হয় বইকি।

তোমাকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেলেছি।

শনিচারিয়া অমনি বলল, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেলে আমিও তোমার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন শোধ দেব তোমার এই সময়ের অপচয়ের।

বললাম, তাহলে তোমার দেশোদ্ধার?

চুপ করে গেল শনিচারিয়া। আমি হেসে হাসপাতালে উঠে এলাম।

কয়েক দিন পরের কথা। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে রাউণ্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি বামিয়া আর শনিচারিয়া গভীরভাবে কি যেন আলাপ করছে।

আমি এলাম, পাশের ঘরে চলে গেলাম, ওরা কথা বলায় এমনি মত্ত যে আমার আসার সাড়াই পেলনা।

ভাবলাম, বেচারা পায়ে আঘাতের ফলে বাইরে বেরুতে পারছে না, তাই মনের নির্জনতাটুকু ঘোচাতে চায় যে কোন একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

পাশের ঘরে এসে আমি পোষাক ছাড়লাম। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। বসে থাকতে থাকতে কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল।

সাসাংদা কোথায় জানিস বামিয়া?

ওখানে তো আমার মামার বাড়ী।

দুপুরে একদিন যেতে পারবি ওখানে?

কেন পারব না। তুমি বললে আমি সব পারি।

তারপর আরও কি সব কথা হল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

শনিচারিয়া বামিয়াকে সাসাংদায় পাঠাতে চায় কেন। কি উদ্দেশ্য ও মনে মনে পোষণ করে রেখেছে!

আমার মনে এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু আমি শনিচারিয়াকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ও যখন সহজ মন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করে, তখন একটি অবোধ শিশুর মত ওকে মনে হয়। একটি কিশোরী যেন চপলতা প্রকাশ করছে কথায় কথায়। আবার কখনো ভীরু চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ও গভীর হয়, আপনার ভেতর ডুবে থাকে সবকিছু ভুলে, তখন ওর দিকে সসম্ভ্রমে আমি তাকিয়ে থাকি।

আমার চেয়ে বয়সে ও কত ছোট, তবু মনে হয় কি বিপুল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ও বসে আছে। ওর সঙ্গে আমাদের ব্যবধানটা তখন বড় বেশী করে চোখে পড়ে।

বামিয়ার সঙ্গে ওর কথা আমার কৌতূহল জাগালেও, এ নিয়ে শনিচারিয়ার সঙ্গে আমি কোন রকম আলোচনা করতে পারলাম না।

এমনি কেটে গেল কয়েকটা দিন। এক দুপুরে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি, বামিয়া উধাও।

এদিকে রান্নাঘরে এসে দেখি, ফল বা দুধের কোন ব্যবস্থাই সে করে যায়নি। কিছু পরেই রোগীদের ঘরে ঘরে ফল আর দুধ দিয়ে আসতে হবে।

আমি চিন্তিত হলাম। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় রান্নাঘরে এসে ঢুকল শনিচারিয়া।

বললাম, তোমার না ডিসপেনসিং রুম থেকে বের হওয়া বারণ, তবে কেন এখানে এলে? এমন করে চলাফেরা করলে সহজে পাটা সারবে?

ও কোন কথা না বলে বসে গেল ফলের ঝুড়ি আর ছুরি নিয়ে। ফল কেটে কেটে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্লেটে সাজাতে লাগল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আজ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে যাও ডাক্তার। তোমার রোগীরা খুব খুশি হবে।

বললাম, তা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বামিয়া কোথায়?

শনিচারিয়া বলল, একটু বাইরে গেছে, ফিরতে খানিক দেরী হতে পারে।

আর কোন প্রশ্ন না করে আমি নিজেই নিয়ে গেলাম ফলের প্লেটগুলো।

শেষে রান্নাঘরে এসে দেখি, শনিচারিয়া আরও এক প্লেট ফল আর দুধ কার জন্যে যেন রেখেছে।

আমাকে দেখেই বলল, আর একটু পরে তোমার খাবার সময় হবে, তখন খেও।

আর কোন কথা না বলে ও ওর ঘরে উঠে চলে গেল। দেখলাম, বড় কষ্ট করে পাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও।

মনে হল, সারাটা বনে যে মেয়ে বিদ্যুতের মত খেলে বেড়াত, আজ সে সামান্য একটা হাসপাতালের ভেতর বন্দী হয়ে আছে।

এ সব কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে দুঃখ পেতাম। কিন্তু আমার সাধ্যমত চেষ্টাতেও শনিচারিয়াকে সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

ওর পায়ের ক্ষতটা দিনে দিনে আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

শনিচারিয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বেডের ওপরে শুয়ে ও একখানা ডাক্তারী বইএর পাতা উল্টেপাল্টে দেখছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, তুমি ডাক্তার হলে আমাকে যে বেকার হতে হবে শনিচারিয়া।

ও হেসে বলল, আমি পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলাম তোমার হাসপাতালে। তুমি যখন সুস্থ রয়েছ তখন আমার কাজগুলো তুমিই কর। আর তুমি আমার কাজে গেলে তোমার কাজগুলো আমাকেই তো চালিয়ে নিতে হবে। তাই বই পত্তর দেখে রাখছি।

বললাম, তাহলে তোমার দেশের উদ্ধারও হল, আর আমার হাসপাতালও চলল।

শনিচারিয়া বলল, দেখে নিও, একটু ভাল হলেই আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেমন ডাক্তারী করি।

বললাম, ডাক্তার হতে হলে নিজের শরীরটাকে আগে সুস্থ রাখতে হয়। আজ দুধ আর ফল খেয়েছ ?

শনিচারিয়া বলল, একজন ডাক্তার সুস্থ থাকলে অনেক রোগীই

সুস্থ হতে পারে। তাই দুধ আর ফল তোমারই আগে খাওয়া দরকার। তিনটে বাজল, এখন যাও তোমার খাবার সময় হয়ে গেছে।

আমি বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। পেছন থেকে ও ডাক দিয়ে বলল, তুমি বরং বসো এখানে, আমি এনে দিচ্ছি।

বললাম, বেডের সঙ্গে এবার দেখছি তোমাকে বেঁধে রাখতে হবে।

একটা হাসির ঝলক ভেসে এল ওর ঘর থেকে।

তুমি আমাকে বাঁধবে ডাক্তার। তোমার এমন দড়ি নেই যা দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রাখতে পার।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, তবে কি দিয়ে বাঁধব বলে দাও। বিনা দড়িতে বাঁধার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

আমার দেশের মানুষকে তুমি ভালবাস, সেই ভালবাসায় আমিও বাঁধা পড়ে গেছি ডাক্তার।

ফিরে এলাম কিচেনে। ওর জন্যে ফল কাটলাম। তারপর দুটো প্লেটই নিয়ে গেলাম ওর ঘরে।

এসো খাওয়া যাক্।

কি যেন ভাবল ও।

তারপর বলল, জান ডাক্তার, এই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটুখানি খাবার অনেকে একই সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। তাতে কারো ক্ষুধা মেটেনি, কিন্তু মন ভরেছে। একই সঙ্গে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পেয়েছি।

বললাম, দুর্ভিক্ষই তোমাদের সমস্ত মনের বল নষ্ট করে দিয়েছে।

ও বলল, এ কথা মিথ্যে নয় ডাক্তার, তবে বনের মানুষগুলোর অনেকেই কিন্তু সাহায্য নিতে চায়নি। আমি অনেক বুঝিয়ে ওদের রাজী করিয়েছি।

তোমার বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে শনিচারিয়া। মিথ্যে মানুষগুলোকে মেরে ত কোন লাভ নেই।

শনিচারিয়া কি যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ডাক্তার, প্রকৃতির ওপর মানুষের কোন হাত নেই। প্রকৃতি মানুষকে এগিয়ে যাবার পথে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলেও দেয়।

বললাম, এত বড় বীর নেপোলিয়ানকেও একদিন প্রকৃতির আঘাতে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

আমি তা জানি ডাক্তার। তারপর কতক্ষণ কি ভেবে ও বলল, বৃষ্টি যদি এ বছর সমানে চলত তাহলে হয়ত এতদিনে এ বনের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতে পারত।

সেজন্যে ভেবোনা শনিচারিয়া, বৃষ্টি আবার শুরু হবে।

কিন্তু আমার মানুষগুলোর ভাঙা মন কি করে জোড়া লাগবে সর্দার?

তোমার ভালবাসার টানেই তারা আসবে।

কিন্তু আমি যে তাদের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারছি না ডাক্তার।

এর উত্তর আমার কাছে ছিল না। শনিচারিয়া আমাকে প্রশ্ন করেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই বললাম, তোমাকে সারিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করছি শনিচারিয়া। নিশ্চয়ই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শনিচারিয়ার মুখে করুণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সুস্থ হই আর না হই, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমার কথা আমার মনে থাকবে ডাক্তার।

এত অল্পেই তুমি ভেঙে পড়ছ শনিচারিয়া। তুমি না বনের মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছ ?

আজকাল মাঝে মাঝে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি ডাক্তার। মনে হয়, আমার এতবড় কল্পনার সব কিছুই কি করে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ওর হাতে দুধের গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললাম, শরীরটাকে সুস্থ রাখ, তাহলে মনের দুর্বলতাগুলো সহজে জয় করতে পারবে।

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে আসতে সেদিন একটু রাত হয়ে গেল।

এসেই দেখি বামিয়া ইতিমধ্যে এসে গেছে। রাতের খাবার তৈরীর কাজে মন দিয়েছে সে। আর তার পাশের ঘরে জানালায় বসে তাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে শনিচারিয়া। আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালা খুললেই কিচেন দেখা যায়।

রাতের খাওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে বসলাম। চাঁদের আলোয় এই বনভূমি কেমন রহস্যময় মনে হল। কতদিন এই চন্দ্রালোক-ধোয়া পাহাড়ী পথ ধরে আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছি। বনের হিংস্র পশুর ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। আমি চলে গেছি কত পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে, কত ঝর্ণার পাশ দিয়ে। রাতে বনের ফুল কি মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়।

কে যে এসে তাদের গন্ধ আঘ্রান করে তা আমি জানি না। হয়তো কোন দিন দুধসাদা চাঁদের আলোয় মৌমাছিরা উড়ে আসে ঐ সব ফুলের বনে। অথবা কোন হরিণ ঝর্ণার ধারে শালের ফুলের গন্ধে এসে দাঁড়ায় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। রাতের জগত কি রহস্যময়, কি রোমাঞ্চকর। দিনের বেলা মানুষের চলাফেরার

পথে, সহস্র কাজ কর্মের মাঝে প্রকৃতি নিজেকে তেমন করে প্রকাশ করে না। কিন্তু রাতে যখন দিনের কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে আসে, তখন প্রকৃতি তার মুখের ওপর ঢেকে রাখা ওড়নাখানা সরিয়ে ফেলে। তখনই তার অপরূপ রূপের দেখা পাওয়া যায়। চাঁদের আলোয় সে স্নান করে। সবুজ অরণ্যের কোমল একটা লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে।

পাহাড়ী জ্যোৎস্নার ওড়না ঢাকা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভাবছিলাম কত কথা।

শনিচারিয়া পাশে এসে বসল। ডিসপেনসিং রুম থেকে আমার বাইরের ঘরের বারান্দা একটু দূরেই বলতে হবে। ওর পক্ষে ঠিক এতখানি পথ না আসাই উচিত ছিল। তবু ওকে কিছু বলতে পারলাম না। এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার প্রেমে কতক্ষণ দুজনেই মগ্ন হয়ে রইলাম।

শনিচারিয়া প্রথমে কথা বলল, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে ডাক্তার ?

তোমার দেশের এই চাঁদের আলো আমার কাছে বিটোফেনের সংগীতের মত মনে হয়।

শনিচারিয়া মিষ্টি একটা হাসি হাসল।

তুমি ডাক্তার না শিল্পী আমি মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

হেসে বললাম, মাঝে মাঝে তাহলে আমার কথা ভাব শনিচারিয়া !

ও বলল, তুমি আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছ।

বললাম, সেকি ! ভাবতে কাউকে কখনো কেউ বাধ্য করতে পারে।

তুমি করনি ঠিক, কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছি ভাবতে।

কথা ক'টি বলে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শনিচারিয়া।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখন যে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে, সব কিছু ভুলে কি গভীর হয়ে ও ওর চিন্তার ভেতর ডুব দিয়েছে।

একসময় ও যেন আবেগে ভেঙে পড়ল, আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলতে পার, কেন তুমি আমার জন্যে এত করছ ? তুমি জান, আমি তোমার দেশের, তোমার জাতির শত্রু, তবু কেন আমাকে এমন করে আশ্রয় দিলে। আমি এর কোন প্রতিদানই তো তোমাকে দিতে পারব না ডাক্তার।

বললাম, বার বার তুমি একটি ভুল করছ শনিচারিয়া। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আহতকে সেবা করা আমার ধর্ম। যে কোন ঘটনাতেই হোক, আমরা সেদিন যখন ঐ শালের বনে মুখোমুখি হলাম, তখন তুমি সুস্থ নও। তার পরের কর্তব্যটুকু আমি স্বাভাবিকভাবেই করেছি। সুতরাং এখানে দান প্রতিদানের কথাই আসে না।

এবার কি ভেবে হাসি ফুটল শনিচারিয়ার মুখে।

বলল, বেশ আছি ডাক্তার। বনে বনে অভুক্ত থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়াতাম তার ঠিকঠিকানা নেই। এখন নিশ্চিন্ত আরামে তোমার আশ্রয়ে যে ক'টা দিন কাটান যায়, সেই লাভ।

অন্য কথার অবতারণা করলাম, বামিয়াকে কোথায় পাঠিয়েছিলে শনিচারিয়া ?

ও আমার ডান হাতটা ওর দুটো হাতের ভেতর নিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ও প্রশ্ন এখন করো না ডাক্তার।

কিছুক্ষণ থেমে কি ভেবে আবার বলল, তোমার দেওয়া অধিকারের অপব্যবহার করছি, তাই না ? কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। অধিকার যখন দিয়েছ, তাকে পুরোপুরি ভোগ করতে দাও।

বললাম, বামিয়া ছেলেটা যেমন বিশ্বাসী তেমনি কাজের তাই না ?

ও বলল, আমার দেশের সব ছেলেমেয়েরাই তাই।

তাই তোমার দেশকে এমন ভালবেসে ফেলেছি শনিচারিয়া।

ও বলল, যখন তোমার দেশের মানুষ আমার দেশে এসে শোষণ আর অত্যাচার শুরু করল তখন তাদের ক্ষমা করতে পারি নি। আমি প্রতিদিন তাদের বিরুদ্ধে আমার মনের ঘৃণাকে সঞ্চয় করেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেছে ডাক্তার। কতকগুলো মানুষকে দেখে একটি জাতিকে বিচার করা যায় না।

বললাম, তোমাদের ওপর ইংরাজদের ব্যবহারে আমি লজ্জিত হই শনিচারিয়া।

তুমি কেবল ইংরাজ হলে আমি তোমাকে ভালবাসতাম না ডাক্তার। তুমি একটি সুন্দর হৃদয়বান মানুষ বলে তোমার ওপর আমার এত আকর্ষণ।

বললাম, আচ্ছা শনিচারিয়া, তুমি দেশকে ভালবাস না মানুষকে ?

তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না ডাক্তার। একটু সহজ করে বুঝিয়ে বল।

মনে কর একটি দেশকে তুমি ভালবাস, আবার একটি মানুষও তোমার কাছে প্রিয়। সেখানে প্রয়োজন হলে তুমি কাকে ত্যাগ করতে পার ?

এ প্রশ্ন কেন ডাক্তার ?

এ আমার নিছক কৌতূহল শনিচারিয়া।

ও স্থির হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর বলল, দেশ চিরদিনই মানুষের চেয়ে বড়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে।

যেমন ?

যদি কোন মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে দেশ মানুষের চেয়ে বড়। কিন্তু যেখানে একটি মানুষ নিজের আশ্চর্য ক্ষমতায় দেশের গণ্ডীর বাইরেও মনটাকে তুলে ধরতে পারেন, সেখানে দেশের চেয়েও আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি।

বললাম, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই শনিচারিয়া। একটি মানুষ যত বড়ই হোন, দেশের চেয়ে কি করে তাঁকে বড় বলব তা বুঝতে পারি না।

শনিচারিয়ার গলার স্বর গম্ভীর হল। দেখেছি, মনের কোন গভীর উপলব্ধির কথা বলতে গেলে সে খুব জোরের সঙ্গে তা বলার চেষ্টা করে।

দেশকে একান্ত করে ভালবাসার ভেতর একটু স্বার্থপরতা মিশে আছে। সেখানে মানুষের মন দেশে দেশে বিভেদের গণ্ডীকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ দেশের মোহ কাটিয়ে সবার জন্যে নিজেকে দান করেন, তিনি দেশের চেয়েও বড়।

তুমি তাহলে তোমার দেশের জন্যে সংগ্রাম করছ কেন ?

আমি দেশের জন্যে সংগ্রাম করছি না বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি বললেই ঠিক হবে। সে অন্যায়টা যেহেতু আমাদের দেশের মাটিতেই ঘটছে, তাই তাকে দেশের হয়ে যুদ্ধ বলতে পার।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম শনিচারিয়ার দিকে। এই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আমার মনে হল পৃথিবীটা কত কাছে সরে এসেছে। সারান্দার এই শৈলঘেরা বনভূমির সঙ্গে আমার দেশের কোথায় যেন হুবহু একটা মিল আছে। এই অরণ্য কন্যাটির মুখে আমি সারা পৃথিবীর ছায়া-মণ্ডল দেখতে পেলাম।

১০ই জুন ঃ

বামিয়া আর শনিচারিয়া প্রায় রোজই একটা খেলা খেলে। আমি সে খেলার একমাত্র দর্শক।

আমার কোয়ার্টারের পেছনেই একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা শালের গাছ। ডিসপেনসিং রুমের জানালা দিয়ে শনিচারিয়া তীরের খেলা খেলে। তার পাশে থেকে শিক্ষা-নবিশি করে বামিয়া।

বামিয়া শাল গাছের কোন একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করে। অমনি সুঁই করে ছুটে যায় একটা তীর। আমি অবাক হয়ে যাই শনিচারিয়ার লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখে। নির্দিষ্ট স্থানের ঠিক মধ্যবিন্দুতে শনিচারিয়ার তীর বিদ্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে হাডসনের চেয়েও লক্ষ্যে একাগ্র শনিচারিয়া। হাডসন স্যুটিং এ বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ বনে হাডসনের তুল্য দক্ষ শিকারীও কেউ নেই। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে শনিচারিয়া হাডসনের চেয়েও দক্ষ।

আমার কোয়ার্টার থেকে ওরা লক্ষ্য ভেদ করে। হাসপাতাল থেকে কেউ তা দেখতে পায় না। আমি বারান্দায় বসে বসে ওদের খেলা দেখি। আজকাল বেলাশেষের কিছু আগে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই চলে আসি ওদের খেলা দেখতে।

এই ব্যাপারটা আমাকে কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে তীরের খেলায় আমাকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে বামিয়া। লক্ষ্যে প্রায় অব্যর্থ সে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বারান্দায় বসে আছি। লক্ষ্য-ভেদের খেলা তখনও শুরু হয়নি। আমি তাকিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপর শাল গাছ গুলোর দিকে। দেখি, পাহাড় বেয়ে বামিয়া উঠছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

যেখানে ছটো শাল গাছ গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে উঠেছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল বামিয়া। কিছুক্ষণের ভেতর এক অদ্ভুত কাণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটেছে তার দিকে। উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু বামিয়া দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মত। তার মাথা ঘেঁষে, কান, বুক, হাত ঘেঁষে তীর গুলো বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে শালের গাছে।

এক সময় তীর ছোঁড়া শেষ হল। বামিয়া বেরিয়ে এল। মনে হল, শালের গাছে তীর দিয়ে আঁকা হয়েছে একটি মানুষের অবয়ব।

উঠে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে শনিচারিয়া; পায়ের কাছে পড়ে আছে ধনুকটা। আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ও ফিরে তাকাল। মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে।

বামিয়ার জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে, তাই না ডাক্তার? বললাম, তোমার ওপর বিশ্বাস থাকলেও ভয় আমি সত্যিই পেয়েছিলাম।

ও অমনি বলল, আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা আজ করছিলাম।

হেরে গেলাম, তাই না?

ওর মুখের কেমন যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল একটা বেদনা ধীরে ধীরে ছায়া ফেলছে ওর মনের ওপর। ও নীরব হয়ে রইল কতক্ষণ।

একসময় বলল, তোমার ওপর বিশ্বাস হারালে আমার আর কি রইল ডাক্তার। একটা পঙ্গুকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। যখন তার মাথার লোভে তোমারই দলের লোক ঘোরাঘুরি করছে, তখন সে পরম নিশ্চিন্তে স্থান পেয়েছে তোমারই কাছে। এর চেয়ে বিশ্বাসের

পরীক্ষা আর কি হতে পারে। আর যা হই, আমাকে তুমি অকৃতজ্ঞ ভেবোনা ডাক্তার।

পরিস্থিতিটাকে সহজ করবার জন্যেই বললাম, বামিয়ার কিন্তু তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। তুমি তীর ছুঁড়ছ, আর ও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। অন্য কেউ হলে, সে একেবারে দাঁড়াতেই পারত না।

ও আমাকে ভালবাসে ডাক্তার।

বললাম, ভালবাসাই বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

আমার কথা শুনে চুপ করে রইল শনিচারিয়া। কতক্ষণ এমনি থেকে হঠাৎ এক সময় বলল, তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস ডাক্তার ?

হেসে বললাম, এ ধারণা তোমার কি করে হল ?

তুমিই তো বললে, ভালবাসার থেকেই বিশ্বাস জন্মায়। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমি তোমাকে এতখানি বিশ্বাস করতাম কি করে।

বললাম, তোমাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধাও করি। তোমার ভেতর জোয়ান অব আর্কের মত আগুনের ছোঁয়া পেয়েছি বলেই শ্রদ্ধা করি শনিচারিয়া।

আর ভালবাস কেন ডাক্তার ?

তুমি আমার পেসেণ্ট বলে। প্রতিটি রোগীকেই আমি ভালবাসি।

এবার অন্যমনস্ক হল শনিচারিয়া। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি জোয়ান অব আর্কের কথা বলছিলে না ডাক্তার। আমি তাঁর কথা ইতিহাসে পড়েছি। তিনি তো তোমার দেশের শত্রুই ছিলেন।

শত্রু ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রী, এ কথা বলতে পারি।

শনিচারিয়া আমার ডান হাতখানা আবার তুলে নিল, তুমি জাতির চেয়ে মানুষকে শ্রদ্ধা কর, তাই তোমাকে আমিও শ্রদ্ধা করি ডাক্তার।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। হাসপাতাল থেকে সন্ধ্যে বেলা রাউণ্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফেরবার পথে দেখি পাহাড়ের তলায় একটা সাদা কালোয় মেশা প্রকাণ্ড ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখি, পাশের একটা পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘোড়াটা দেখে বিস্মিত হলাম। হাডসনের ঘোড়া আমি চিনি। আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের সব ঘোড়াই আমার চেনা। তাহলে এই নতুন ঘোড়া এল কোথা থেকে! কোয়ার্টারে গেলাম। সম্ভবতঃ নতুন কোন অতিথি এসে থাকবেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখলাম না। বামিয়াকে জিজ্ঞেস করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে শনিচারিয়াকে এই রহস্যময় ঘোড়ার কথা জানালাম।

আমার মুখে কথাটা শুনে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল শনিচারিয়া। তার চোখে মুখে প্রবল এক উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠল। বললাম, কি হল তোমার শনিচারিয়া। হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়ালে কেন?

তুমি আমাকে একবার ওর কাছে যাবার অনুমতি দেবে ডাক্তার?

তুমি কেন যাবে, আমিই নিয়ে আসছি ওকে।

না, আমার যাওয়া দরকার। ও আমারই ঘোড়া। তাছাড়া আমার লোকেরা নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও আছে।

একা তোমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয় শনিচারিয়া। আমি তোমাকে বরং যেতে সাহায্য করতে পারি।

তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে ওরা কিছুতেই কাছে আসতে চাইবেনা ডাক্তার।

তাহলে ?

শনিচারিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর বলল, বামিয়াকে আমার সঙ্গে দাও। ওর ওপর ভর রেখে আমি এটুকু পথ চলে যেতে পারব।

বামিয়াকে নিয়ে শনিচারিয়া চলে গেল। আমি বারান্দায় এসে বসলাম।

এলোমেলো কত কথা আমার মনে আসতে লাগল।

সেই প্রথম দিনটির কথা, যেদিন শনিচারিয়ার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল। সেদিনও বোধকরি এমনি একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার পথ রোধ করে ও দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কি ক্ষিপ্রতায় ও আমাকে বর্ষার ভেতর আমার পরিচিত পথের ওপর পৌঁছে দিয়ে গেল।

কতদিন কত কথা শুনেছি ওর সম্বন্ধে। কত নতুন বুদ্ধির খেলা ও দেখিয়েছে লড়াইএর সময়। ওর বিচক্ষণতাকে দূর থেকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি।

তারপর একদিন ও এসে ধরা দিল আমারই কাছে। কি বিশ্বাসের ছবি ও প্রথম দিন দেখেছিল আমার চোখে, যে জন্যে নির্ভয়ে সে আমার কাছে চলে আসতে পারল।

আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই ও আমাকে বিশ্বাস করেছে।

মানুষকে ভাল না বাসলে ডাক্তার হব কি করে। মানুষে মানুষে ভেদ, দেশে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন রাজনীতিজ্ঞেরা, কিন্তু ডাক্তারের বৃত্তি তো তা নয়। আমাদের কাছে প্রতিটি

মানুষের মূল্যই এক। দেহের অস্থিমজ্জার গঠনে রাজা প্রজা বলতে তো কোন ভেদ নেই।

শনিচারিয়া আমার এই মনোভাবের প্রশংসা করে। কিন্তু ও ডাক্তার হলে বুঝতে পারত এতে প্রশংসা করবার কিছু নেই। এ আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

আচ্ছা, আমি কি শনিচারিয়াকে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করছিনা। আমি আমার সরকারের অর্থ নিচ্ছি, তার সেবা করা, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কি আমার উচিত নয়। শনিচারিয়া আমাদের সরকারেরই তো বিরুদ্ধাচরণ করছে।

কিন্তু অন্যায় করেছে আমার সরকার। শনিচারিয়া তার দেশকে ভালবাসে, এটা তার অপরাধ হতে পারেনা। পরদেশের মানুষকে পীড়ন করা যদি অন্যায় না হয়, তাহলে পরদেশের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হয়।

আমার দেশ, আমার জাতি মানুষকে পীড়ন করে যে অন্যায় করেছে, আমার সেবা দিয়ে যদি তার সামান্য পরিমাণও স্খালন করতে পারি।

আচ্ছা, শনিচারিয়া যদি আর ফিরে না আসে। সে যদি তার দলের লোকজনের সঙ্গেই চলে যায় গভীর অরণ্যে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন দমে গেল। একটা দুর্জয় অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ও কি যাবার আগে একবারও আসবে না আমার কাছে। শনিচারিয়া কৃতজ্ঞতা জানাক তা আমি চাইনা। আমি কর্তব্য করেছি, কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এতদিন একই সঙ্গে রইলাম, তাই যাবার আগে স্বাভাবিক সৌজন্যটুকু দেখিয়ে যাবে না।

কি এলোমেলো ভাবছি আমি। শনিচারিয়া রক্তাক্ত দেহ নিয়ে একদিন যদি তার দেশের মানুষের হয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসতে পারে তাহলে আজ আমি তার আচরণকে সন্দেহ করব কেন।

কত রাত এমনি ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে শনিচারিয়া এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে বামিয়া। হাতে খাবারের প্লেট।

আজ এইখানে বসেই তোমার ডিনার হোক্।

ওকে দেখে মন হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল।

বললাম, এসো আমরা একসঙ্গে বসে খাই।

শনিচারিয়া ইঙ্গিত করল। বামিয়া আমার খাবার রেখে ওর খাবারটা আনতে গেল।

তুমি এতক্ষণ আসনি দেখে মনে মনে বেশ চিন্তিত হচ্ছিলাম।

হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, ভাবনা হচ্ছিল বুঝি, যদি আর ফিরে না আসি।

চলে গেলেও যে বলে যাবে, সে ধারণা আমার আছে।

বড় দেরী হয়ে গেল আমার, তাইনা ?

বললাম, রাত কত হল তা ঠিক বুঝতে পারিনি। টুকরো টুকরো ভাবনার ভেতর সময়টা কেমন নিঃসাড়ে কেটে গেল।

কি ভাবছিলে ডাক্তার ?

যদি বলি, তোমার কথা।

শনিচারিয়া হেসে বলল, খুব স্বাভাবিক। এত বড় একটি রোগী বাইরে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ালে ডাক্তারের ভাবনা হবে বইকি।

বামিয়া খাবার দিয়ে গেল। আমরা দুজনে গল্প করতে করতে খেতে লাগলাম।

শনিচারিয়া বলল, আজ বহুকাল পরে আমার দলের কোন কোন সর্দারের সঙ্গে দেখা হল ডাক্তার।

বললাম, শুভ সংবাদ। কিন্তু কি করে তারা তোমার সন্ধান পেল ?

তুমি কিছু অনুমান করতে পার ?

এদিক ওদিক ভেবে বললাম, বামিয়া ওদের খবর দিয়েছে নিশ্চয়।

পারলে না ডাক্তার।

তবে ?

তোমার মত ওরাও আমার তীরের খেলা লক্ষ্য করেছে।

সে কি !

হাঁ, ডাক্তার। কয়েকদিন থেকে আশপাশ ঘুরে ওরা তীরের খেলা দেখছিল। যেদিন বামিয়াকে দাঁড় করিয়ে তীর ছুঁড়লাম, সেদিন ওরা আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।

তারপর ?

ওরা ভেবেছিল আমি এখানে আহত অবস্থায় বন্দী হয়ে আছি। তাই আমার ঘোড়াটাকে সাহায্যের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তোমার ঘোড়া কোথায় ছিল ?

যেদিন গুলিতে আহত হলাম, সেদিন ঘোড়াটা ছেড়ে-দিয়েছিলাম। ওরা তাকে বনের পথে ধরেছিল। কিন্তু আমি কোথায় আছি তা জানতে পারেনি।

এখন কি করবে তুমি ?

হেসে বলল, তোমার চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হয়ে উঠব।

তাড়াতাড়ি সারতে না পারলে ?

কোন ক্ষতি নেই। ওরা আমার সন্ধান জেনে গেল। এখান থেকেই আমি ওদের পরামর্শ দিতে পারব।

বললাম, এটা সরকারী হস্‌পিটাল, পলিটিকাল মিটিংএর জায়গা নয়।

তুমি যে জায়গায় হাসপাতাল করেছ, ওটা আমাদেরই দেশের মাটি ডাক্তার।

আচ্ছা, এটা যে তোমাদের জায়গা তা না হয় মানলাম, কিন্তু হাসপাতাল এলাকায় মিটিং করা কি উচিত?

শনিচারিয়া হেসে বলল, চিন্তা করোনা ডাক্তার। যেদিন মিটিং হবে সেদিন আমি তোমার হাসপাতাল থেকে দূরে চলে যাব।

যদি তোমাকে অনুমতি না দিই।

আমাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে ডাক্তার?

এ কি বলছ তুমি শনিচারিয়া! ডাক্তার যদি রোগীকে বাইরে যাবার অনুপযুক্ত মনে করে, তাহলে রোগী কি তার অবাধ্য হবে?

আমার কথা শুনে শনিচারিয়া হঠাৎ মুখ নীচু করল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। যদি অশোভন কিছু বলে থাকি, সে জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

বললাম, চিন্তিত হয়োনা। তেমন বুঝলে অবশ্যই তোমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে।

১৭ই আগষ্ট ঃ

কি বিপুল কর্মের উদ্যম দেখলাম শনিচারিয়ার। দুটি মাসের ভেতর সিন্ধবাদের গল্পের সেই অতিকায় পাখির মত দুটি ডানা মেলে সারা বনভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কি অসাধারণ প্রাণের জোয়ার। আমার কতটুকু সাধ্য ওকে বাধা দিয়ে রাখতে পারি। প্রথম প্রথম এক আধটু বাধা দিয়েছি; অমনি আমার তুটি হাত ধরে ও অনুনয় করেছে, আমাকে একবারটি যেতে দাও ডাক্তার। এই বর্ষার সুযোগ হারালে আর কখনো দাঁড়াতে পারবনা।

ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে ইচ্ছা করলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, সে যখন অনুমতি ভিক্ষা করে, তখন তাকে বাধা দেবার মত মনের শক্তি থাকেনা।

মাঝে মাঝে আমি বিশেষ তুঃখিত হয়েছি। বলেছি, নিজের পাখানাকে দিনের পর দিন এমন করে জখম করছ কেন শনিচারিয়া ?

ও উত্তর দিয়েছে, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে, পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনা বলেই তো এমন করে পাখানাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার।

আমি আর কোন কথাই বলিনি। বোধহয় বলতে পারা সম্ভব ছিল না।

বর্ষার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল শনিচারিয়া। পাহাড়ী বন্যার মত আদিবাসীরা ভেঙে পড়ল বরাইবুরুর পুলিশ ক্যাম্পগুলোর ওপর।

গত লড়াইএর পর সরকারী আর্মড ফোর্সের বেশী অংশই বন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীরা ঐ সুযোগ পেয়ে গেল। তারা বরাইবুরু দখল করে নিল।

হাডসন ছাতমবুরু থেকে কিছু সংখ্যক ফোর্স আনালেন কুম্‌ড়ির বাংলো রক্ষার জন্যে।

খণ্ড খণ্ড লড়াই চলল। বহুক্ষেত্রে আদিবাসীরাই জয়ী হল। এই বর্ষাই তাদের একমাত্র ভরসা। প্রকৃতির এই সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে আর কোন আশাই থাকবে না তাদের।

একদিন শনিচারিয়া ফিরে এল হাসপাতালে। দেখলাম, ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। ক্ষোভের সঙ্গেই বললাম, হয় তুমি একেবারে বাইরে চলে যাও, নয়তো চিকিৎসার ভেতর থাক কয়েক দিন।

ও বলল, এই চরম মুহূর্তে তুমি কি বলছ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষগুলো একমাত্র আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

উত্তেজনায় কাঁপছিল ও।

বললাম, এমন ভাবে রক্ত পড়তে থাকলে আর দু'চার দিনও তারা তাদের নেত্রীকে তাদের মাঝে পাবে না।

শরীরের অবস্থাটা কি খুব খারাপ ঠেকছে ডাক্তার ?

তোমার মত আমি উত্তেজিত হইনি শনিচারিয়া। আমি ডাক্তার। রোগীর অবস্থাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উত্তেজনার কারণ।

শনিচারিয়া আমার নির্দেশে কয়েক দিন চিকিৎসার ভেতর থেকে গেল। একটা উত্তেজনার তাড়নায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; বুঝতে পারেনি, ভেতরে ভেতরে ও কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উত্তেজনার পরেই অবসাদ। মাঝে মাঝে শনিচারিয়া আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় কেবল যুদ্ধের প্রলাপ চলতে থাকে। আমি সাধ্যমত সেবা করি। যখন ও জ্ঞান ফিরে পায় তখনই বামিয়াকে কাছে ডেকে নির্দেশ দিয়ে পাঠায় তার দলবলের কাছে। এমনিভাবে কাজ চলতে থাকে।

এক সন্ধ্যায় ফিরে এল বামিয়া। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, কোথায় যেন কি একটা অঘটন ঘটেছে।

গোপন খবরটা শনিচারিয়াকে দেবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তখন শনিচারিয়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

আমি বামিয়াকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললাম, খবর যত গুরুতরই হোক্, শনিচারিয়ার অসুখ তার চেয়েও গুরুতর। সুতরাং একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে কিছু বলা চলবে না।

মনে হল ও আমার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

বললাম, কি ব্যাপার বামিয়া?

ও যা বলল তার অর্থ হল, শনিচারিয়ার দলের প্রধান সর্দার আজ গুলীর ঘায়ে মারা গেছে। দলের সাধারণ লোকেদের মনে ক'দিন থেকেই এ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল, শনিচারিয়াকে সরকার নাকি বন্দী করে ফেলেছে। সে খবর শুনে দলের ভেতর ভাঙন ধরেছিল। তারপর আজ সর্দার মারা যেতে সবাই বরাইবুরু ছেড়ে বনের ভেতর আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় শনিচারিয়া সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে ওরা সবাই ফিরে আসত।

শনিচারিয়ার কাছে গেলাম। ও তেমনি পড়ে আছে আচ্ছন্ন হয়ে। মনে হল, ওর জাতির এই চরম অবস্থার কথা ওকে একবার জানানো দরকার। নইলে আমিই হয়ত ওদের এই পরাজয়ের জন্য দায়ী হয়ে যাব।

কাছে গেলাম, ধীরে ধীরে জাগাবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ও একবার চোখ মেলে পরক্ষণে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। বামিয়া আর আমি শনিচারিয়ার জাগার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পরের দিন খবর এল, সরকার পক্ষের নতুন ফৌজ-বাহিনী

জামদা থেকে মার্চ করে আসছে। আদিবাসীরা সে খবর পেয়ে গভীর বনের ভেতর লুকিয়েছে।

এবারের পরাজয় আদিবাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল। যে উদ্যম নিয়ে ওরা শুরু করেছিল, সেটুকু শেষ অবধি বজায় রাখতে পারলে, সরকার হয়ত বনের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারত। চিরস্থায়ী একটা সুযোগ সুবিধেও ভোগ করতে পারত তারা। কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য তা নয়। শনিচারিয়ার আঘাত আজ সমস্ত অরণ্যের মানুষদের ওপর চরম আঘাত হানল।

২৩শে অক্টোবর ঃ

পায়ের আঘাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে শনিচারিয়া, কিন্তু মনের ক্ষত আরোগ্য হবে কি করে।

সারাদিন বসে থাকে ঘরের ভেতর। ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে দূরের উপত্যকার দিকে। উপত্যকার শেষে ছোটনাগরার সীমানা। ওর পিতার রাজ্য, ওর বাল্য, কৈশোরের স্বপ্নভূমি। হয়ত ও ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা। স্বপ্ন দেখে, আবার সে রাজ্য সে ফিরে পেয়েছে। সেখানে থেকে সে জড়ো করছে অরণ্যের সাধারণ মানুষদের। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলছে তাদের।

আজকাল আমি যখন ওকে ডাক দিই তখন কেমন অসহায় দুটো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকায়। যা বলি, কোন প্রতিবাদ না করে তাই শোনে।

ওর এই অসহায় ভাবটা আমাকে বড় পীড়া দেয়। যার ইঙ্গিতে সারা বনের মানুষ প্রাণ দিতে পারত, আজ সে সামান্য একটা ঘরের ভেতর অন্যের আশ্রয়ে তার দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

একদিন বসলাম ওকে প্রবোধ দিতে।

বললাম, রবার্ট ব্রুসের সাধনার কথা তুমি জান। তাহলে এমন ভেঙে পড়ছ কেন শনিচারিয়া।

ও আমার দিকে তাকাল। মুহূর্তে মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

বলল, কোন আশার আলো যে দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার।

এখন তোমার তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে যে সুযোগ এসে যাবে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না।

আমার দেশের মানুষ কি আর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে।

তুমি শক্তি জোগালে তারা আবার জাগবে।

তুমি জান না ডাক্তার, যে খাবার দেয়, মানুষ তার কাছে নিজেকে বিক্রি করে। তোমাদের সরকার আমার দেশের সাধারণ মানুষকে খাবার দিয়ে বশ করেছে।

আমার মনে হয় আদিবাসীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ তোমার অনুপস্থিতি। আর একটা কারণ, আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের অভাব। তীর আর বর্শা নিয়ে বন্দুক বা বোমার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

শনিচারিয়া কতক্ষণ বসে বসে কি যেন চিন্তা করল।

তারপর এক সময় বলল, তুমি ঠিক বলেছ ডাক্তার। আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া লড়াইতে দীর্ঘস্থায়ী জয়লাভ অসম্ভব।

বললাম, অস্ত্রশস্ত্রের দিকে নজর দাও।

কেমন বিষণ্ণ করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ডাক্তার। আমার যা কিছু সম্বল, সবই

ফেলে এসেছি ছোটনাগরায়। আমি জানি, ইংরাজরা তার খোঁজ হয়ত পাবে না, কিন্তু আমার সেগুলি আনার পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বললাম, চেষ্টা করে দেখ, একটা কিছু উপায় বের হবেই।

ও আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভুলে গেল আমার অবস্থিতি। আমি কাজে বেরিয়ে এলাম হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে দেখি শনিচারিয়া গভীরভাবে বামিয়ার সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছে।

আমাকে দেখে শনিচারিয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তুমি খুব ভাল ডাক্তার।

কি হল আবার। হঠাৎ আমার প্রশংসা শুরু করলে!

না ডাক্তার, তুমি না বললে আমি হয়ত আর চেষ্টা করার শক্তিই পেতাম না।

নতুন কি পরিকল্পনা নিচ্ছ?

শনিচারিয়া হেসে বলল, সে অতি গোপনীয়। পরে পরে প্রকাশ পাবে। তবে এখন সোণার খনিতে ঢোকার চেষ্টা করছি।

বললাম, কাজ সহজ নয়, হুসিয়ার থেকো।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, বামিয়াকে হাসপাতাল থেকে কয়েকদিন বাইরে রাখতে হবে ডাক্তার।

বললাম, বামিয়া কি এখনও আদেশের অপেক্ষায় আছে?

শনিচারিয়া গম্ভীর হল। একসময় মুখ তুলে বলল, জানি, তোমার ওপর আমাদের অত্যাচার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

তা ভেবে কিন্তু কথাটা বলিনি শনিচারিয়া। এ নিছক কৌতুক।

ও বলল, কৌতুক হলেও কথাটা সত্য।

ওকে সহজ করে দেবার জন্যে বললাম, তুমি বড় বেশী গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ আজকাল। বামিয়াকে বাইরে পাঠাবে, এ জন্যে আমার অনুমতির দরকারটা কি পড়ল তা বুঝতে পারছি না। সাধারণ রোগী আর তোমার মধ্যে পার্থক্যটা কি নতুন করে বলে দিতে হবে।

শনিচারিয়া সহজ হল।

বলল, বামিয়াকে ছোটনাগরায় পাঠাব।

সে কি, সেখানে যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে!

শনিচারিয়া কপট ক্রোধের ভান করে বলল, এ তোমার ভারী অন্যায় ডাক্তার। বামিয়া চিরদিন তোমার কাছে চাকরী করবে এমন দাসখত সে লিখে দেয়নি। তার এখন ইচ্ছে হয়েছে, ছোট-নাগরার নতুন মনিবদের কাছে দু'দিন চাকরী করে।

এতক্ষণে ওদের পরামর্শের বিষয়টা আমার বোধগম্য হল।

শনিচারিয়া ছোটনাগরায় বামিয়াকে পাঠিয়ে তার সঞ্চিত গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে, আর তাই দিয়ে কিনবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হেসে বললাম, বামিয়া তার নতুন মনিবদের চিত্ত আর বিত্ত দুইই হরণ করে ভালয় ভালয় ফিরে আসুক, এই কামনা করি।

ঝর্ণার কলধ্বনির মত হাসির ঢেউ তুলল শনিচারিয়া।

সে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম। শুধু বামিয়া বসে রইল অনুগত আজ্ঞাবহের মত।

২৫ শে ডিসেম্বর ঃ

হঠাৎ ডরোথি আর রেবেকা হাসপাতালে হাজির।

কি ব্যাপার!

ডরোথি অমনি বলল, অসুখ না হলে বুঝি আসতে নেই?

বললাম, তা কেন, তবে আমার কোয়ার্টার ঠিক কুম্‌ডির বাংলোর মত সুসজ্জিত কিংবা আরামদায়ক নয়, তাই বিশিষ্ট অতিথিরা এলে সঙ্কোচ বোধ করি।

রেবেকা আমাদের কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

এবার মুখ খুললেন, ডরোথি হাসপাতালে আসবে বলে ক'দিন থেকে অস্থির করে তুলেছে।

নিজেকে এ জন্যে ভাগ্যবান মনে করছি।

ভাগ্যটা ঠিক কোন পক্ষের তা এখুনি হলফ করে বলা যায় না মিঃ জনসন।

ডরোথি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি ওদের ড্রইং রুমে এনে বসালাম।

বললাম, ব্যাচিলারের ডেরায় যখন এসে পড়েছেন তখন সবকিছু নিজেদের করে নিতে হবে কিন্তু।

রেবেকা বললেন, ও ভয় আমাদের দেখাবেন না ডাক্তার। আপনাদের চেয়ে ঘরকন্নার কাজ আশাকরি আমরা আর একটু ভাল করেই করতে পারব।

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন, আমি কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। শনিচারিয়াকে এঁরা কেউ চেনেন না ঠিক, ওকে পেসেন্ট বলে চালিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু হাসপাতালে না রেখে ডিসপেনসিং রুমে রাখার কি কৈফিয়ৎ দেব আমি।

অবশ্য গোপন করা যেতে পারে সবকিছু, কিন্তু তার জন্যে দরকার প্রচুর সাবধানতা।

শনিচারিয়াকে ওদের উপস্থিতির কথা জানাতেই ও বলল, রান্নাঘরের দিকে জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিলে তোমার কোয়ার্টারের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগই রইবে না।

বললাম, সবকিছু খুব সাবধানে করে যেতে হবে।

শনিচারিয়া বলল, আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনার কোন কারণ নেই, কেবল বামিয়ার জন্যে যা কিছু ভাবনা।

কেন, বামিয়া যে আমার এখানে কাজ করে তাতো ওদের অজানা নয়। সুতরাং তার হঠাৎ এসে পড়াতে ক্ষতি কি ?

তুমি সত্যিই বোকা ডাক্তার। বামিয়ার হঠাৎ করে আসাটাকে কেউ লক্ষ্য না করলেও ওর হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা কারো লক্ষ্য এড়াবে না।

ওকে একবার সাবধান করে দিলে ও রাতে আসতে পারবে।

সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, বলল শনিচারিয়া।

বেলা শেষে আজকাল ডরোথি আর রেবেকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে হয়। আমি যত রকমের ফুল আর লতার নাম জেনেছি, তাই ওদের এক এক করে চেনাই। ডরোথির এসব শিক্ষায় আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার ডরোথি যে গুণী শিল্পী তা আমার জানা ছিল না। ও সঙ্গে এনেছে ওর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। পথে বেরুলেই সঙ্গে নিয়ে চলে স্কেচের খাতা। পাহাড়ী আঁকবাক, শালগাছ, আদিবাসীদের ঘর দোরের ছবি আঁকায় ওর বিশেষ আগ্রহ।

পাহাড়ী বস্তিগুলোতে প্রতিদিন ওদের একবার করে যাওয়া চাই। রেবেকা আদিবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। ওদের সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি খবর লিখে রাখেন

ওঁর ডায়েরীতে। বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মকর্ম, গান, উপকথার ইতিহাস বহু পরিমাণে সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

ডরোথি স্কেচের পর স্কেচ করে যাচ্ছে। মেয়েদের দল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে নাচ, ছেলেদের আদুল গায়ে তীরধনু নিয়ে শিকার, ঝর্ণা থেকে মাথায় কলস বসিয়ে মেয়েদের ঘরে ফেরা, এইসব ডরোথির বিশেষ প্রিয় সাবজেক্ট।

সন্ধ্যেবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আমি একবার হাসপাতালে রাউণ্ড দিয়ে আসি। তারপর বারান্দায় বসে বসে গল্প শুরু হয়। দেশের গল্প। আত্মীয় পরিজনের কথা। লণ্ডনের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের ওপর।

কতদিন নিজের দেশ দেখিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কত দূরে সরে এসেছি। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি আসে। কতবার ফিরে ফিরে সে চিঠি পড়ি। আমার মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের চিঠি।

মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলা। বাবা প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি আবার বিয়ে করলেন। আমার বিমাতার অনেকগুলি সন্তান। তারা লণ্ডনেই লেখাপড়া করছে। নিজের একটিমাত্র বোন। কত আদরই না তাকে করতাম। সে এখন সুখেই টমাসের ঘর করছে।

মনে মনে এমনি আমরা তিনটি প্রাণী হারিয়ে যাই আমাদের ফেলে আসা পুরোণো জীবনে।

গল্পের ভেতর একদিন আমি পিটারের কথা তুলেছিলাম। ডরোথি দেখলাম একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। ও প্রসঙ্গ থেকে সে নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। রেবেকা দু'চার কথা বললেন। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করলেন তিনি।

বুঝলাম, পিটার মুছে গেছেন ওঁদের মনের ক্যানভাস থেকে।

ডরোথি ভার নিয়েছে আমার পোষাক পরিচ্ছদের। আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছিলাম, কিন্তু রেবেকাই মাঝে পড়ে আমার সংকোচ দূর করে দিয়েছেন।

রেবেকা বললেন, কুমারী মেয়ের কিছু কিছু সংসারের কাজ হাতে কলমে করা দরকার। ডরোথি যদি পোষাকগুলো যত্ন করে রাখতে পারে তাহলে সেটা তার শিক্ষা। সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না ডাক্তার।

হেসে বললাম, আপনারা কোন কাজে বিরক্তবোধ না করলে আমার দিক থেকে বিব্রত বোধ করার কোন কারণই থাকে না।

ডরোথি আজকাল আমার কাছে কাছেই থাকতে চায়।

সেদিন বলল, আমি আপনার সঙ্গে থেকে হাসপাতালের কিছু কিছু কাজ করতে চাই।

বললাম, বেশ ভাল, কিন্তু কি কাজ করবেন ?

কিছু না পারলেও নার্সিং তো করতে পারব।

বললাম, নার্সিং খুব সহজ কাজ নয়। তবে মন বসাতে পারলে সব কাজই সহজ হয়ে আসে।

আমি চেষ্টা করব।

হেসে বললাম, কিন্তু কতদিন সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন ?

ও বলল, যতদিন না আপনি আমাকে বরখাস্ত করেন।

বললাম, মিঃ হাডসন আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

কি করে বুঝলেন ?

এখানে রোগীদের ভেতর আদিবাসীর সংখ্যাই বেশী। এখন ওদের সঙ্গে সরকারের যে ভাবটা চলেছে তাকে কোনমতেই

সম্ভাব বলা চলে না। এ অবস্থায় আদিবাসীর সেবা অমার্জনীয় অপরাধ।

আপনি করছেন কি করে?

আমি প্রথমে ডাক্তার, তারপর সরকারের লোক। আমার কাছে সব মানুষের জাতই এক।

ডরোথি চুপ করে রইল।

বললাম, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হওয়া তৃপ্তির বা গৌরবের সন্দেহ নেই, কিন্তু সবার জীবন এক ধারায় বয় না।

আমি যদি সে জীবন গ্রহণ করি?

তাতে বাধা দেবার কিছু নেই। তবে আপনি যে জীবন পেয়েছেন তা চেষ্টা করলেই পাওয়া যায় না।

ডরোথি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইল।

হেসে বললাম, ফুল যদি তার নিজের গন্ধের কথা জানতে পারত তাহলে সে আত্মগর্বের জন্যে মানুষের কাছ থেকে এতখানি স্তুতি পেত না।

আমাকে বড় বেশী বাড়িয়ে তুলছেন ডাক্তার জনসন।

আপনার শিল্পসত্ত্বাকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন। ছবি আঁকতে চাইলেই আঁকা যায় না। ও প্রতিভা আসে ভেতরের অলক্ষ্য কোন ক্ষমতার থেকে।

ডরোথি কোন উত্তর না করে মুখ নীচু করে রইল।

একদিন এসে পড়লেন হাডসন। হৈ হৈ জুড়ে দিলেন। কাজকর্মের বাইরে মানুষটি বিশেষ আমুদে।

বললেন, ডাক্তার তোমার রোগীরা কেমন আছে বল?

বিশেষ কোন জটিল কেস এখন হাতে নেই। মোটামুটি ভালই বলতে পারা যায়।

আমি কিন্তু তোমার হাসপাতালের সাম্প্রতিক ছুটি রোগীর কথাই বিশেষ করে জানতে চাইছি।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি হেসে উঠলাম।

বললাম, রোগের বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও ধরা পড়ছে না।

হাডসন বললেন, রোগ ধরার দু'রকমের চোখ আছে। আমাদের এই ছুটো চোখে দেহের রোগ হয়তো ধরা পড়ে, কিন্তু মনের রোগ ধরার আলাদা চোখ চাই।

ডরোথি অমনি বলল, অপবাদটা বড় বেশী সোজাসুজি হয়ে যাচ্ছে।

হাডসনের হাসি আর থামতেই চায় না।

ডরোথি যে বিশেষ ধরণের রোগে ভুগছে, আশাকরি এ কথা না বলে দিলেও তুমি বুঝতে পারছ ডাক্তার।

মোটেই তা নয়, ডরোথি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তা কি করে বিশ্বাস করি বল। আমরা ভুক্তভোগী। তোমার অবস্থা আমরা পার হয়ে এসেছি। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আমাদের আছে। তোমার কিংবা ডাক্তারের নেই।

আবার তেমনি উচ্ছল হাসি ছড়াতে লাগলেন হাডসন।

বললাম, ডাক্তার কিন্তু নিজের চিকিৎসা করতে চায় না।

হাডসন বললেন, এ ব্যাপারে ডিগ্রি না থাকলেও আমার ওপর চিকিৎসার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

বললাম, আক্রমণটা কিন্তু প্রথমে আমার দিকে ছিলনা।

হাডসন বললেন, এ এক অদ্ভুত শিকার ডাক্তার জনসন। এ শিকারে একসঙ্গে দু'জনকেই লক্ষ্য করতে হয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আপনার আর একটা শিকার কিন্তু অনেক দিন দেখিনি। উড়োপাখি শিকার।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন হাডসন। বললেন, মানুষ শিকারের কাজ এখন বন্ধ আছে, চল সবাই মিলে পশুপাখি শিকার করে বেড়াই।

কবে যাচ্ছেন? ডরোথির গলায় কৌতূহল।

কালই চল।

চারটে ঘোড়া এল। আমরা শিকারে চললাম সদলবলে। আমাদের সঙ্গে রইল আদিবাসী কয়েকটি কুলি কামিন।

সারাদিন বনবাদাড় ভেঙে চলল শিকার পর্ব। ডজন খানেক বন মোরগ, আর কয়েকটা খরগোস কপালে জুটল। বনের মাঝে মিলল একটি খোলামেলা জায়গা। বড় সুন্দর জায়গাটি। পাশেই একটি ঝর্ণা। তার দু'দিকে বড় বড় নুড়ি পাথর পড়ে আছে। পাশে বেশ খানিকটা অংশ সবুজ সমতল।

আমরা কতদিন পরে কাজের বাইরে একই দেশের ক'জন মানুষ একসঙ্গে মিললাম।

গান গাইলেন রেবেকা। চমৎকার সুরেলা গলা। আগেও আমি রেবেকার গান শুনেছি। কিন্তু বনের এই নিভৃত লোকে রেবেকার গান বড় অদ্ভুত শোনাল।

রান্নার ভার পড়ল রেবেকার ওপর।

হাডসন সত্যিই সুখী। মনে হল, রেবেকার জীবন প্রভু যীশুর কৃপায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মাংস তৈরীর ভার আমার ওপর।

হাডসন বললেন, কেমন অপারেশন কর তা আজকে দেখা যাবে।

ডরোথি আর রেবেকা কাছে এল। আমি জীবদেহের এক একটা অংশ ওদের কাছে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আজকের ঘটনার সবচেয়ে ইনটারেস্টিং বিষয় এই ডিসেকসন পর্ব।

হাডসন বললেন, এটা তোমার মত না সবার সেটা যাচাই করে দেখতে হয়।

রেবেকা বললেন, আমিও ডরোথির সঙ্গে একমত।

হাডসন বললেন, মন্ত্র জান ডাক্তার। ক'দিন হাসপাতালে থেকে ওরা তোমার ভক্ত হয়ে গেছে।

ডরোথি অমনি বলল, আপনিও এমনি একটি হাসপাতালের ভার নিন, তাহলে আমরা আপনারও ভক্ত হয়ে পড়ব।

হাডসনের আবার সেই হাসি।

আমি খোদ চিড়িয়াখানার ভার নিয়ে বসে আছি।

আমাদের চিড়িয়া ভাবলেন নাকি ?

আমার চিড়িয়াখানার চিড়িয়া না হলেও বিধাতার চিড়িয়াখানার জীব, এটা অস্বীকার করতে পার না।

হাসি, গল্প, গানে আমাদের সারাদিনের আসর জমে উঠল।

বেলা শেষে ফেরার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খবর এল, পথে হাতি দেখা গেছে।

ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ, এর মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যাই কেমন করে।

এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল।

আদিবাসীরা আমাদের বনের ভেতর অপেক্ষা করতে বলে আশ পাশে বস্তির খোঁজে খাদ বেয়ে নেমে গেল। আমরা কতক্ষণ

ঐ একই জায়গায় বসে রইলাম। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল সমস্ত বনভূমি।

চোখের ওপর পাহাড়ী পথটা মুছে গেল এক সময়। আদিবাসী লোকগুলো আর ফিরে এলনা।

কারো মুখে কথা নেই। বিচিত্র সব কীট পতঙ্গ ডাকতে শুরু করল।

কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ হতেই ডরোথি ভয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

হাডসন বললেন, আমার মনে হয়, কুলিরা পথ হারিয়েছে। ওদের নিশানা দেবার জন্যে ফায়ার করা যাক্।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাডসন বন্দুক তুলে ফায়ার করলেন পর পর কয়েকটা।

আধঘণ্টা কাটল। কোন সাড়াশব্দ নেই। একই জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে আছি যে কোন রকম একটা অঘটনের।

হঠাৎ রেবেকা চীৎকার করে উঠলেন, ঐ যে বনের আড়ালে সারি সারি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

আমরা উৎফুল্ল হয়ে সেদিকে তাকালাম।

হাডসন বললেন, আমার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার দেখছি কাজ দিয়েছে।

কিছু সময়ের ভেতর মশালধারীরা এসে পড়ল আমাদের কাছে।

কিন্তু একি, এদের ভেতর আমাদের পরিচিত লোকগুলি কই! দেখলাম, চেনা লোকগুলির একটি মাত্র রয়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা এসে প্রথমেই হাডসনের হাতের বন্দুকটা টেনে কেড়ে নিলে।

হাডসন এ রকম ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি হঠাৎ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ওরা এবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের আগে পিছে চলতে

লাগল। বুঝতে পারলাম, আমরা আদিবাসীদের হাতে বন্দী হয়েছি।

এবার চড়াই উৎরাই ভেঙে আমাদের চলতে হল। কিছুক্ষণ চলার পর চাঁদ উঠল। আমরা এসে পৌঁছলাম একটা ভ্যালির এক প্রান্তে। দু'দিকে পাহাড় উঠে গেছে, মাঝে গিরিখাদ। ঐ গিরিখাদের ঠিক নীচেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছিল। আমরা কিছু সময়ের ভেতর সেখানে গিয়ে পেঁ ছিলাম। কাছে যেতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ল। পাথরের তৈরী দেয়াল। খড়কুটোর ছাউনি।

সারারাত সেখানে আমরা বন্দী হয়ে রইলাম। রেবেকা আর ডরোথিকে কোথায় যেন ওরা সরিয়ে নিয়ে গেল। ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম, ওদের চোখেমুখে ভীতির ছায়া। আমাদের সামনের দরজাটা এক সময় চোখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সেই নির্জন রহস্যময় বনের ভেতর বন্দী হয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে কথা নেই। গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন তিনি। হয়ত ভাবছেন মুক্তির উপায়, হয়ত বা ভাবছেন পরিণতির কথা।

সামনের দরজা আবার খুলল। কয়েকখানা রুটি আর সেদ্ধ ডিম ওরা রেখে গেল আমাদের সামনে। এবার ঘরের ভেতর বসিয়ে দিয়ে গেল একটা টেমি। টিম টিম করে জ্বলতে লাগল টেমিটা।

হাডসন চুপচাপ বসে আছেন দেখে বললাম, কিছু খান।

এ অবস্থায় কিছু খাওয়া যায়না জনসন। কথা ক'টি বলে আবার চিন্তায় ডুব দিলেন হাডসন।

কতক্ষণ পরে বললেন, ডরোথি আর রেবেকাকে কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদের জন্যে দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

বললাম, বিশেষ চিন্তার কোন কারণ আছে বলে মনে হয়না আমার। তাহলে এত খাবার দাবার হয়তো দিত না।

মজার অনুমান তোমার জনসন।

বললাম, আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বললাম।

আমাদের ঘরের একদিকে খুব ছোট জানালার মত ফাঁকা একটা ফোকর ছিল। তার ভেতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

হাডসন সেখানে উঠে গিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। কতক্ষণ কি যেন সব পরীক্ষা করে ফিরে এলেন।

কাণের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, একটা পাথর সরালেই ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

বললাম, ক্ষেপেছেন। আমাদের ঘরের চারদিকে নিশ্চয়ই পাহারা বসেছে। তাছাড়া অপরিচিত পথে গিয়ে কি শেষে বুনো জানোয়ারের মুখে প্রাণটা হারাবেন।

হাডসন বিমর্ষ হয়ে বললেন, তাছাড়া রেবেকা ডরোথি রয়েছে, ওদের ছেড়ে পালান সম্ভব নয়।

বললাম, বিপদ যখন এসেছে, তখন শেষ পর্যন্ত তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করাই ভাল।

এরপর কোন কথা হলনা। আমরা পাশাপাশি দুজনে বসে রইলাম।

রাত তখন কত ঠিক জানিনা, বোধকরি শেষ হয়ে এসেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আমরা প্রায় চমকে উঠলাম।

একটি লোক আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। আমরা ঘরের বাইরে এলাম। আরও কয়েকটি লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের নির্দেশে আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আমরা কয়েক

মিনিটের ভেতর একটি খোলা মেলা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারদিকে পাহাড় আর বন, মাঝে এই খোলা জায়গাটুকু।

আমরা এসেই দেখলাম, বনের কোল ঘেঁষে অনেকগুলি লোক তীরধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কাণে ভেসে এল। কিছুক্ষণের ভেতর অশ্বারোহিণী এক মহিলা আমাদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর তার ঘোমটায় ঢাকা।

রহস্যময়ী রমণী বলল, মিঃ হাডসন, স্বেচ্ছায় আমাদের এলাকায় এসেছ, সেজন্য ধন্যবাদ। অনেক চেষ্টা করেও তোমার দেখা পাইনি।

হাডসন বললেন, ধরা যখন পড়েছি, তখন তোমাদের যা খুশি তাই করতে পার।

হাসল মহিলাটি। বলল, আমার দেশের মানুষকে যেভাবে শাস্তি দাও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সেভাবে শাস্তি দিতে পারি; কিন্তু তাতে কোন কৃতিত্ব নেই। কাপুরুষ যারা, তারাই শুধু ব্যক্তি বিশেষের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পায়।

একটু থেমে আবার বলল, আর তাছাড়া কোন একটি ইংরাজকে শাস্তি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তোমাকে হত্যা করলে, তোমার জায়গায় আর একজন আসবে।

তবে আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?

কিছু নয়, শুধু একটি অনুরোধ করব, আমার দেশের মেয়েদের ওপর, আমার দেশবাসীর ওপর পশুর মত অত্যাচার করো না।

আমরা সরকারের কর্মচারী। সরকারের নির্দেশ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি।

মহিলা বলল, আমি ইংরাজ জাতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু

তোমরা আমাদের দেশে যে কাজ করছ, যে কোন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ তা সমর্থন করবে না।

হাডসন বললেন, তোমরা সরকারকে স্বীকার করে নিলে কোন অত্যাচারের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ইংরাজ সরকার তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধে করে দেবে।

বনের হরিণকে তুমি যতই খেতে দাও হাডসন, ঘরের থেকে সে কেবল বনে পালাবার চেষ্টা করবে।

হাডসন বললেন, সে নিতান্ত বোকা বলে।

মিঃ হাডসন, যার মন বলে কিছু আছে, সে নিশ্চয়ই তোমার কথা মেনে নেবে না।

হাডসন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহিলাটি বলল, একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে এখুনি সঙ্গিনী ছুটি ভদ্রমহিলাকে হাজির করছি।

মহিলাটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর একটি লোক এসে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করল। হাডসন রইলেন, আমি চললাম।

কিছু পথ গিয়ে একটি ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে সঙ্গের লোকটি কোথায় চলে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছিলাম, ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শনিচারিয়া।

বললাম, পায়ের ক্ষত নিয়ে এই রাতে এত পথ না এলেই কি হতো না?

ওরা তো ক্ষেপে গিয়েছিল, হাডসনকে খুন করবে বলে।

আমাকে বাদ দেবার কারণ?

শনিচারিয়া হেসে বলল, তুমি কি মনে কর, ডাক্তার জনসনকে চিনতে আমার দেশের কারো বাকি আছে।

বললাম, কেমন করে তুমি আমাদের বিপদের কথা জানলে শনিচারিয়া ?

তোমার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে।

ওর পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, রক্তে ওর পোষাক ভিজে গেছে।

বললাম, তুমি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে পা নিয়ে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

শনিচারিয়া হেসে বলল, তার চেয়েও ডাক্তার জনসনের সেবার লোভে ফিরে যেতে হবে।

বললাম, কখন যাচ্ছ ?

তোমাদের আগে নিশ্চয়। সেখানে ডাক্তার জনসনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন লোক অন্তত রইবে।

আবার আমি ফিরে এলাম মিঃ হাডসনের কাছে। এসে দেখি, ইতিমধ্যে রেবেকা আর ডরোথি সেখানে এসে গেছে।

আমাদের ঘোড়াগুলো আনা হল। আমরা ঘোড়ায় চড়ে আবার রওনা হলাম। ওদের কয়েকজন লোক আমাদের হাসপাতাল অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। হাডসন কেবল সেই দুর্গম বন-প্রদেশে তাঁর সাধের বন্দুকখানা রেখে আসতে বাধ্য হলেন। সেদিনের শিকার পর্ব আমাদের এমনি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেষ হল।

১২ ফেব্রুয়ারী : ১৯০২

ডরোথি আর রেবেকাকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে হাডসন ফিরে গেলেন কুম্‌ডিতে। যাবার সময় আদিবাসীদের সম্পর্কে আমাকে খুব হুসিয়ার করে দিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসে বললাম, আদিবাসীদের থেকে আপনাকেই বেশী সাবধান হতে হবে মিঃ হাডসন।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি বেলাশেষে আজকাল হাসপাতালের বারান্দায় বসে গল্প করি। রেবেকা কিছুতেই আর বাইরে বেড়াতে যেতে রাজী নয়। আবার যদি আদিবাসীদের হাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

আমি বলি, আদিবাসীরা কিন্তু লোক খারাপ নয়। সেদিন ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু কেমন ভদ্রতা করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ডরোথি বলল, আচ্ছা, ঐ মেয়েটিই কি শনিচারিয়া, ওদের দলের নেত্রী?

বললাম, তাইতো শুনেছি।

রেবেকা বললেন, ওকে ঠিক মত দেখতে পেলাম না। সারা শরীর ওর কালো পোষাকে ঢাকা।

ডরোথি বলল, ঐ মেয়েটিকে নিয়েই যত হাঙ্গামা, ওকে ধরতে পারলে সব গোল চুকে যায়।

রেবেকা বললেন, আমার কিন্তু সেদিন মেয়েটির ব্যবহার বড় ভাল লেগেছিল।

কি রকম?

আমরা যে ঘরে ছিলাম, সেখানে এসে ও বলল, একটি অনুরোধ তোমাদের কাছে করব, তোমরা আমারই মত মেয়ে। আমাদের দুঃখ তোমরা যতটা বুঝবে আর কেউ তেমন বুঝবে না। আমাদের মেয়েদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার করা হয়, তার বিরুদ্ধে তোমরা একটু প্রতিবাদ কর। নিজের দেশকে ভালবাসা তাদের কোন অপরাধ নয়।

ডরোথি বলল, ওর খাম খেয়ালীর জন্যেই তো তাদের ভুগতে হয়।

রেবেকা বলল, এ তোমার ভুল ধারণা ডরোথি। আমাদের দেশের খুব কম মেয়েই ওর মত সাহস আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে।

ডরোথি কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইল। আমি ইচ্ছে করেই আলোচনার ভেতর নিজেকে জড়ালাম না। শুধু বললাম, লক্ষ্য করেছেন বোধহয়, ও আমাদের দেশের ভাষাতেই কথা বলে।

ডরোথি এবার আমার পক্ষে এসে গেল।

বলল, শুধু আমাদের ভাষায় নয়, ওর উচ্চারণ কি করে এমন বিশুদ্ধ হল, তাই ভাবি।

রেবেকা বললেন, আমি বুঝতেই পারি না, একজন আদিবাসী মেয়ে ইংরাজী ভাষাটা শিখল কি করে।

বললাম, যাদের নেতা হবার ক্ষমতা থাকে, তাদের কাছে আপনাদের ওটুকু বিস্ময় কিছুই না।

শনিচারিয়ার প্রসঙ্গ শেষ করলাম। অনেকগুলি কথার ভেতর জড়িয়ে পড়লে নিজের মনের কথাই বেরিয়ে আসবে। তখন কোন ছিদ্র দিয়ে কি অঘটন যে ঘটে যাবে তা বলা যায় না।

ডরোথি আমার খুব কাছাকাছি থাকতে চায়। আমার পরিচর্যার ভার ধীরে ধীরে সে ই হাতে তুলে নিয়েছে। এসব কাজে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু আমার ভেতর বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে অন্য কথার অবতারণা করে। আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পারি। ডরোথির শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু মনের যে আশ্রয়টুকুতে একটি মাত্র নারীকে এনে বসান যায়, সেখানে ডরোথির ছায়া পড়ে না। ডরোথি একদিন পিটারের

প্রতি আসক্ত ছিল বলে আমি ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। আমি ডরোথিকে ঘৃণা করার কোন কারণই খুঁজে পাই না। তবে মন ভালবাসার ক্ষেত্রে তার নিজের একটা পথ ধরে চলে ; সেখানে বাইরের যুক্তি, বিবেচনার কোন ধারই সে ধারে না।

একদিন ডরোথি বলল, আজ বাইরে একটু বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে যাবেন কি ?

বললাম, আপনার দিদি হাসপাতালের বাইরে যেতে কি রাজী হয়েছেন ?

না।

তাহলে দুজনেই যাওয়া যাক্।

ডরোথি বলল, আমাদের কোয়ার্টারের ঐ পেছনের পাহাড়টাতে একটু ঘুরে আসি চলুন। ওখান থেকে চারদিকটা খুব সুন্দর দেখায়।

বললাম, সে তো খুব ভাল প্রস্তাব। দূরে কষ্ট করে যেতে হবে না, অথচ কাছে থেকে দূরের আশ্চর্য জগতটাকে নিকটে পাওয়া যাবে।

ডরোথি একটা মন্তব্য করে বসল।

আপনি আসলে কিন্তু কবি। ডাক্তার হয়েছেন, কেবল একটা বৃত্তিকে গ্রহণ করতে হয় বলে।

হেসে বললাম, এ কিন্তু আমার বৃত্তির ওপর কটাক্ষ করা হচ্ছে। সরকার আপনার মুখের এই বাক্যগুলি শুনলে আমাকে এই হাসপাতালে রেখে বেশী দিন কবিত্ব করার সুযোগ দেবে না।

ডরোথি আমার কৌতুকের ওপর কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে বলল,

আমি কিন্তু আপনার বৃত্তির ওপর কোন মন্তব্য করছি না। বরং আপনার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করার চেষ্টা করছি।

খুশি হলাম আপনার কথায়। নিজে শিল্পী বলে প্রতিটি মানুষকে আপনি সেই দৃষ্টিতে দেখেন। এখন চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর উঠি।

ডরোথি বলল, আপনার পোষাক আমি শোবার ঘরে রেখে এসেছি।

কেন, যে পোষাকটা পরে আছি সেটা পরে গেলে হয় না?

আমার অনুরোধ; ডরোথি চোখেমুখে অনুনয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল।

পোষাক ছাড়তে ঘরে গেলাম। আমার বিশেষ সখের একটি পোষাক ছিল, ডরোথি আজ তাই বের করে দিয়েছে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সে পোষাক আমি ব্যবহার করি।

প্রথম যখন সাসাংদাতে চার্চের উদ্বোধনে যাই, তখন এ পোষাকখানা পরেছিলাম। আজ হঠাৎ আবার এখানা পরতে হল।

বেরিয়ে এসে দেখি, ডরোথি ইতিমধ্যে তার পোষাক পরিবর্তন করে ফেলেছে।

আমরা হাসপাতালের পেছনের পাহাড়টাতে উঠলাম। ডরোথি আমাকে ইসারায় ঝর্ণাটার কাছে যেতে বলল। ঝর্ণার ধারে কয়েকটা শালগাছ। শালগাছের পাশেই একশিলা একটা পাথর পড়ে আছে। আমরা ঐ পাথরটার ওপরে গিয়ে বসলাম।

ডরোথি আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখুন ডাক্তার জনসন, সামনের ঐ ভ্যালি আর দূরের পাহাড়গুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

বললাম, ঐ অঞ্চলটাই ছোটনাগরা।

ডরোথি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ওখানে আমাদের সঙ্গে আদিবাসীদের একটা লড়াই হয়েছিল না?

আপনার মনে আছে দেখছি।

সে যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছিল।

বললাম, যুদ্ধ ছাড়াও ঐ জায়গাটা আর একটি বিশেষ কারণে বিখ্যাত।

ডরোথি আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

বললাম, ঐ ছোটনাগরাই ছিল আদিবাসীদের নেত্রী শনিচারিয়ার রাজধানী। আর ওখানকার দুর্গে থেকেই শনিচারিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

ডরোথি কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, আমার কিন্তু শনিচারিয়াকে একেবারে আদিবাসী মেয়ে বলে মনে হয়না।

আপনার অনুমান মিথ্যে না হলেও একেবারে সত্য নয়। শনিচারিয়া আদিবাসী এক রাজার মেয়ে। সেই আদিবাসী লোকটি ঘটনাচক্রে ইয়োরোপে গিয়ে শিক্ষিত হয়ে এসেছিল। আর শনিচারিয়ার মা ছিল রাজপুতানী।

ডরোথি বলল, ভারী মজার ইতিহাস। এ আপনি সংগ্রহ করলেন কি করে ?

লোকমুখে শুনেছি।

ডরোথি বলল, রাজপুতদের ইতিহাস আমি বম্বে থেকে পড়েছিলাম। অত্যন্ত চমকপ্রদ। রাজপুত মেয়েরা অসি নিয়ে যুদ্ধ করে। তাছাড়া নিজেদের সম্মান রাখার জন্যে আগুনে পুড়ে মরতেও নাকি ভয় পায় না।

বললাম, সেই রাজপুত রক্ত ঐ শনিচারিয়া মেয়েটির মধ্যে রয়েছে, তাই ওর এতখানি সাহস।

ডরোথি হঠাৎ বলে বসল, আজ আর শনিচারিয়ার প্রসঙ্গ ভাল লাগছেনা ডাক্তার জনসন, এখন আপনি আপনার নিজের গল্প করুন।

হেসে বললাম, আমার গল্প !

হ্যাঁ, আপনার জীবনের কথা। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি নিশ্চয়ই এই বুনো জায়গায় খুব বেশী দিন কাটাবেন না।

জায়গাটা আপনার ভাল লাগছেনা বুঝি ?

আপনিই বলুন, বেশী দিন এই বন কারো ভাল লাগে। প্রথম প্রথম ছবি আঁকার মোহে পড়েছিলাম, এখন আর একটুও ভাল লাগছে না।

বললাম, আমার বেলা ঠিক উল্টো। প্রথমে আমার এখানে এসে একটুও মন বসেনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই আমি এই বনের মোহে পড়ে যাচ্ছি।

আপনি কি দেশে একেবারেই ফিরবেন না ?

একেবারে ফিরব না এ কথা কেমন করে বলি। তবে এই বন আমাকে কি যেন এক মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে।

কিছুসময় চুপচাপ মুখ নীচু করে বসে রইল ডরোথি। তারপর হঠাৎ বলল, আপনি যতদিন না দেশে ফেরেন ততদিন আর একটি মেয়েরও দেশে ফেরা হচ্ছেনা জানবেন।

সে কি, কে সে মেয়ে! আমার জন্যে তার দেশে ফেরা বন্ধ থাকবে কেন ?

হ্যাঁ, তার জায়গাটা ভাল না লাগলেও সে থাকবে এখানে।

ভাল না লাগলে সে থাকবেই বা কেন ?

এই বন ছাড়াও তার এমন কেউ আছে, যার জন্যে তাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

সে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলতে হবে, একটি মেয়ে যার জন্যে নিজের দেশের মায়া কাটিয়েও এইখানে থেকে যেতে চায়।

সে মেয়েটির ওপর আপনার কি একটুও মায়া হয়না? ডরোথি জিজ্ঞাসু চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সে মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম। আমাদের একেবারে পাশেই যে শালের গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ে এসে বিঁধে গেছে একটা তীর। আশ্চর্য, সেই তীরের সঙ্গে বাঁধা একটা সূতো থেকে ঝুলছে একগুচ্ছ মরশুমী ফুল।

ডরোথি ভয়ে, কৌতূহলে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ডিসপেনসিং রুমের জানালায় বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসির রেখা দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ডরোথি আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাবার আগেই জানালাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকেই আমি খাবার নিয়ে যাই শনিচারিয়ার ঘরে। রাতে হাসপাতালের কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম। দেখি, শনিচারিয়া জানালার কাছে বসে গরাদ ধরে সামনের ভ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু ও আজ আর ফিরে তাকালনা। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

খাবারটা টেবিলে রেখে দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

সারা ভ্যালি বিচিত্র রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শীতের শেষ, তবু একেবারে শীত চলে যায়নি। চাঁদের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু কুয়াশার একটা পাতলা চাদর ভ্যালির ওপর কে যেন পেতে রেখেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল শনিচারিয়া।

বললাম, কি ভাবছ ?

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বলল, দেখ ডাক্তার, কি আশ্চর্য সুন্দর আমার এই দেশ।

তাইতো তোমার দেশকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনা শনিচারিয়া।

ও আমার দিকে তাকাল ; তোমার অশেষ অনুগ্রহ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমার নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে শুভ-কামনা জানাচ্ছি।

একটু থেমে ম্লান একটা হাসি হেসে বলল, কবে দেশে ফিরছ ?

হঠাৎ দেশে ফেরার কথা কেন শনিচারিয়া ; আমি কি তোমাদের দেশের মানুষের সেবা যত্ন ঠিক মত করতে পারছিনা ?

এ কথা বলে আমাদের দেশের মানুষকে অপরাধী করোনা ডাক্তার। আমি শুধু বলছিলাম, মিলিত জীবন সাধারণতঃ মানুষ নিজের দেশেই কাটায়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কবে দেশে ফিরছ।

আমি তো মিলিত জীবন অনেক দিনই যাপন করছি শনিচারিয়া।

অবাক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, তোমার দেশের মানুষের সঙ্গে আমার জীবন অনেক আগেই মিলিত হয়েছে। ফুলের উপহার আরও আগে আমার পাওনা ছিল শনিচারিয়া।

ও কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ক্ষমা কর ডাক্তার, আমি তোমাকে চিনেছি বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল, কিন্তু সে গর্ব আমার আজ ভেঙে গেছে। তুমি আমার চেনার সীমানাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমাকে এত বড় করে দেখবার চেষ্টা করে লজ্জা দিওনা। তোমাদের দেশের মানুষের কাছে থাকতে পেরে, তাদের ভালবাসা পেয়ে আমি মনে মনে গর্ববোধ করি শনিচারিয়া। আমি তোমাদেরই একজন, এটুকু অন্তত আমাকে সহজ করে ভাবতে দাও।

শনিচারিয়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমার হাতখানা সে আরও নিবিড় করে ধরে রইল তার হাতের মধ্যে।

১৪ই মার্চ ঃ

আজও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না আমি। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মুখখানা। ডান দিকটা আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। চোদ্দ পনের বছরের কিশোর।

যেদিন প্রথম আগুনে পুড়ে এল আমার হাসপাতালে, সেদিন তার ভেতর যে সহ্য শক্তি দেখেছিলাম, তা আমার ডাক্তারী জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

সেই মা বাপ হারা কিশোরটি ভাল হয়ে উঠল একদিন। হাসপাতাল থেকে যেদিন ডিসচার্জ করলাম, সেদিন ও এসে আমার কোয়ার্টারের আশেপাশে কেবল ঘুরতে লাগল।

ডেকে বললাম, বামিয়া তুই ভাল হয়ে গেছিস, এখন আর হাসপাতালে থাকতে হবেনা, ঘরে ফিরে যা।

কোন কথা না বলে ও আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ভোরে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, কে যেন হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি বামিয়া।

সারারাত ছেলেটা কিছু না খেয়ে এখানে পড়ে আছে। কেমন কষ্ট হল। ওকে উঠিয়ে রুটি আর দুধ খাওয়ালাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চুপচাপ মুখ নীচু করে ও বসে রইল দাওয়ার এক কোনে।

কাছে ডেকে বললাম, কে আছে রে তোর বাড়ীতে?

ও মুখখানা আরও নীচু করে বসে রইল।

বললাম, বাবা নেই?

ও মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

মা?

তাও না। মা বাপ, ভাই বোন কেউ নেই তার। কলেরা মহামারীতে সব উজাড় হয়ে গেছে।

বললাম, কি করতিস তাহলে তুই তোর গাঁয়ে?

বামিয়া এবার মুখ খুলল, গাঁয়ের মাতব্বরের ক্ষেতে কাজ করতাম। দিনে একবেলা করে খেতে দিত। রাতে শুয়ে থাকতাম 'জায়েরা'র আস্তানায়।

বললাম, এখন গাঁয়ে ফিরে যা।

ও চুপচাপ বসে রইল।

মনে হল, এখানে হাসপাতালে ক'দিন খেতে পেয়ে ছেলেমানুষ আর কষ্টের ভেতর ফিরে যেতে চাইছেনা।

বললাম, যখন খুব ক্ষিদে পাবে তখন না হয় চলে আসিস এখানে।

ও হঠাৎ উঠে এসে আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলে।

পা ছেড়ে দে, কাঁদছিস কেন?

বামিয়া তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে

দিও না সাহেব। খেতে না দাও, তবু হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বলোনা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবনা।

সেই থেকে বামিয়া রয়ে গেল আমার কাছে। ও আমার পোষাক আশাক পরিষ্কার করত; আর হাসপাতালে খাবার দিয়ে আসত। যে কোন কাজ আমার বলবার আগেই ও করে রাখবার চেষ্টা করত। কথা বলতনা বেশী। নীরবে কাজ করে যেত।

শনিচারিয়া আসার পর ঘটনাচক্রে ও সরে গেল আমার কাজের ভেতর থেকে। আমি ওকে আর বাধা দিলাম না। দেশের কাজে বামিয়াকে দীক্ষা দিল শনিচারিয়া। ঘরে বসেই ওকে করে তুলল দক্ষ তীরন্দাজ।

শনিচারিয়াকে কি ভালই না বাসত ও। শনিচারিয়ার মনের কোণের একটি পাথর কি করে ও সরিয়ে ফেলেছিল। তার থেকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত স্নেহ। সেই স্নেহের ধারায় স্নান করত বামিয়া।

কতদিন আড়াল থেকে আমি দেখেছি, বামিয়ার মাথায় চিরুণী দিয়ে দিচ্ছে শনিচারিয়া। একসঙ্গে একই থালায় দুজনে গল্প করতে করতে খাবার খাচ্ছে। বামিয়া ঘুমিয়ে থাকলে মায়ের চোখ মেলে কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছে শনিচারিয়া।

তাহলে কেন এমন হল। কত যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছেনা। কোথায় যেন একটা অস্থিরতার উৎস-মুখ খুলে গেছে। প্রবল গতি তার। শত চেষ্টাতেও যুক্তির পাথর চাপিয়ে তার প্রবাহ-পথ বন্ধ করা যাচ্ছেনা।

ইদানিং ও আর আমার হাসপাতালে বড় একটা আসত না। কোন দিন রাতে শনিচারিয়াকে খাবার দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতাম, বামিয়া তার কাছে বসে আছে। উত্তেজনার ছবি আঁকা হয়ে থাকত ওর চোখেমুখে। আমাকে দেখে ও মাথা নীচু করত।

তেমনি সংকোচ, প্রথম যেদিনটি ও হাসপাতালে বাহাল হল, সেদিন যেমন সংকোচ দেখেছিলাম।

হেসে বলতাম, কি বামিয়া, হাসপাতাল ছেড়ে আজকাল কেমন আছ ?

মাথা নেড়ে জানাতো, সে ভাল আছে।

বলতাম, তুমি না আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেনা বলেছিলে ?

আমার কথা শুনে ও অপ্রস্তুত হয়ে যেত।

শনিচারিয়া হেসে বলত, ও এখন দেশের কাজ করছে ডাক্তার। দেশ ওর কাছে এখন সব চেয়ে বড়।

বামিয়াকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম, দেশের কাজে ডুব দিয়েছ, খুব খুশি হয়েছি বামিয়া।

ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শনিচারিয়া বলত, জান ডাক্তার, বামিয়ার মত আর দু'একটা ছেলে পেলে আমি তোমাদের হাত থেকে আমার দেশটাকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম।

উত্তর দিতাম, তোমার বামিয়া যথার্থ কাজের ছেলে।

শনিচারিয়া ওকে প্রথমে পাঠাল ছোটনাগরায়। উদ্দেশ্য, শনিচারিয়ার মায়ের সঞ্চিত প্রচুর সোনা বামিয়ার সাহায্যে উদ্ধার করা। সেই সোনা দিয়ে কেনা হবে বন্দুক, রাইফেল ; লড়াই চলবে সমানে সমানে।

নিঃশব্দে কাজ চলল কিছুদিন। কোন কোন রাতে দেখতাম, বামিয়া এসেছে। হয়ত সঙ্গে এনেছে একতাল সোনা।

শনিচারিয়া সোনার তালটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, এটা কি বলতো ?

কেন, সোনার তাল।

শনিচারিয়া অমনি মাথা নেড়ে বলত, হলনা ডাক্তার, ওটা হল, পাঁচখানা বন্দুক আর তিনখানা রাইফেল।

হেসে বলতাম, আজ থেকে নতুন চোখ দিয়েই দেখব।

আচ্ছা ডাক্তার বলতো, ওটা কার সম্পত্তি?

এবার ভেবে চিন্তেই জবাব দিতাম, তোমার মায়ের।

না ডাক্তার, তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। ওটা হল সারান্দা বনের প্রতিটি অধিবাসীর সম্পত্তি। আমার দেশের মানুষ এ সবের অধিকারী।

বলতাম, হার মানছি। তোমার মনের নাগাল পেতে গেলে আমাকে আরও কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

খিল খিল করে হেসে উঠত শনিচারিয়া।

বামিয়া মাথা নীচু করে বসে থাকত চুপচাপ।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, ওদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শনিচারিয়াকে বাইরে যেতে হত। অবশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও বেশী দূর যেতে সাহস করত না। রাতে হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ে অনেকগুলি লোকের আসা যাওয়ার সাড়া পেতাম। বারান্দায় বসে বসে শুনতাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

অনেক রাতে চুপি চুপি ডিসপেনসিং রুমের কাছে গিয়ে দেখতাম, শনিচারিয়া তখনও বসে বসে কি যেন করছে।

দরজায় টোকা দিতাম।' আমার হাতের শব্দ ওর চেনা ছিল। দরজা খুলে যেত।

ঘরে ঢুকে কোনো দিন দেখতাম, একরাশ নোট নিয়ে হিসেব-পত্র করছে। আবার কোনদিন নিজের হাতে ম্যাপ তৈরী করছে।

বলতাম, তোমার গোপন আড্ডার খবরটা এবার সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

হেসে ও বলত, আমার আড্ডা উঠে যাবে ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হাসপাতালও ছাড়তে হবে।

আচ্ছা শনিচারিয়া, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তোমরা আমাকে শাস্তি দেবে ?

শনিচারিয়া কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলত, শাস্তি তুমি নিজের মনের থেকেই পাবে। অন্য কারো কাছ থেকে শাস্তি পাবার দরকারই হবেনা তোমার।

বলতাম, যত অপরাধই আমি করি, তুমি কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে পারবেনা।

শনিচারিয়া গম্ভীর হয়ে বলত, হয় তুমি এখান থেকে যাও, নয় চুপচাপ বসে থেকে আমাকে কাজ করতে দাও। এ তুটোর বাইরে গেলেই আমি তোমাকে ঠিক শাস্তি দেব।

কি শাস্তি দেবে তুমি আমাকে ?

এখুনি ঘোড়ায় চড়ে সারা বন বেড়িয়ে আসব। দেখ, ঠিক ঘুরে আসব আমি। তোমার কোন কথাই শুনবনা।

এই আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ কর। আর বেশী রাত্তির জেগে থেকোনা কিন্তু।

আমি উঠে পড়লেই ও হাত ধরে বসিয়ে বলত, কাজ কতদূর এগিয়েছে শুনবে না ?

তোমার গোপন ব্যাপার যদি ফাঁস হয়ে যায়।

আবার সেই কথা! তুমি চুপচাপ বসে শোন, আমি বলে যাচ্ছি। তোমার মনে কোন রকম প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগলেই কিন্তু বলে ফেল। তাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।

বেশ বল।

শনিচারিয়া বলত, ছোটনাগরা থেকে সে কেমন করে বামিয়াকে দিয়ে সোনা সরাচ্ছে। তার পূর্ব পুরুষদের আদিং বা আত্মা যে

বেদীর তলায় রক্ষিত আছে, আরই পাশে আর একটা বেদীর তলায় রয়েছে তাল তাল সোনা। বামিয়া ছোটনাগরায় পুলিশদের কাছে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ নিয়ে ঢুকেছে। এই সুযোগে সে সরিয়ে আনছে সোনা।

এখন সেই সোনা বেচে সংগ্রহ করা হচ্ছে নোট আর টাকা। তারপর শুরু হবে অস্ত্র সংগ্রহ। এ কাজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই অসমাপ্ত থাকেনা।

শনিচারিয়া তার পরিকল্পনার কথা বলে যেত, আমি চুপচাপ বসে বসে শুনতাম। লক্ষ্য করতাম, কত সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে এই অরণ্য-কন্যা।

সেদিন হাসপাতাল থেকে এসে বসেছিলাম বারান্দায়। আমার পাশে বসেছিল ডরোথি আর রেবেকা। রোজকার মত গল্প হচ্ছিল সেদিনও।

হাডসনের কাছ থেকে ডাক এসেছে। ওরা দু'এক দিনের ভেতরেই হাসপাতাল থেকে চলে যাবে।

ডরোথি একটু বিষণ্ণ। ও আমার কাছ থেকে ওর প্রশ্নের সকৌতুক উত্তরই শুধু পেয়ে গেল, আমার মনের কথা জানতে পারল না। ওর মনের গুরুভার আমি বুঝি। কিন্তু সেই ভার সরিয়ে দেবার মানুষ আমি নই। এ সত্যটুকু আকারে প্রকারে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার অক্ষমতা, আমি ওকে তা কোনরকমেই বোঝাতে পারিনি।

রেবেকা বললেন, এবার অনেক দিন একসঙ্গে আমরা কাটালাম, এ কথা বহুদিন মনে থাকবে।

বললাম, আপনাদের যাবার পরই কিন্তু দুঃখ শুরু হবে আমার।

রেবেকা বললেন, আপনার কিসের দুঃখ, মিঃ জনসন?

একা একা ছিলাম একরকম। এখন আপনাদের সেবা পেয়ে বড় বেশী আয়েসী হয়ে পড়েছি। আবার তো সব নিজেকেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

একটা করুণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল ডরোথি।

মনে মনে ভাবলাম, কথাটা বলে ঠিক করিনি। অন্য একজনের মনের ক্ষতটাকেই খুঁচিয়ে তুললাম শুধু।

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। বসন্তকালের এই সময়টুকু এ অঞ্চলে বড় তৃপ্তিদায়ক। ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। শাল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল পাশের বন থেকে। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বেলা শেষের প্রকৃতির এই দানটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। গুলির আওয়াজ। পর পর কয়েকটা শব্দ হল। আমরা বারান্দা থেকে পথের ওপর নেমে এলাম। ওদিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরে একটি ছেলে প্রাণপণ হাসপাতালের দিকে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে তাড়া করে আসছে একটি অশ্বারোহী পুলিশ। সে বার বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ছেলেটিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। আর একটি অশ্বারোহী সামনের উপত্যকায় নেমে দৌড়ে আসছে। ছেলেটিকে মুখোমুখি ধরবার চেষ্টা করছে সে। তার হাতে ঘুরে চলেছে একটা ফাঁস।

ছেলেটার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একবার পাহাড়ে উঠছে, আর একবার পথে নেমে এঁকে বেঁকে দৌড়চ্ছে। কিছু দূরের থেকে চিনতে পারলাম। বামিয়া দৌড়ে আসছে হাসপাতালের দিকে।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি আর রেবেকা। আমি চীৎকার করে বামিয়াকে থামতে বললাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। বামিয়া পথের ওপর বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। বোধহয় পায়ে লেগেছে গুলি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুটা এগিয়ে এল। পাশের উপত্যকার অশ্বারোহী ততক্ষণে প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, বামিয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল।

কি হল বামিয়ার! গুলির আওয়াজ নেই। ও হঠাৎ পেছন দিকে ছিটকে পড়ল কেন!

দুটি অশ্বারোহী এরপর কি ভেবে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল। তারপর তারা বামিয়াকে তুলে নিয়ে আমার হাসপাতালের দিকেই এগোতে লাগল।

এতখানি দূর থেকে কি হল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অস্থির উন্মাদনায় তাদের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বামিয়াকে ওরা হাসপাতালে এনে তুলল। কি আশ্চর্য, আমি স্তম্ভিত হয়ে বামিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটি তীর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে।

তখনও বুকে সামান্য স্পন্দন ছিল। একটু বাতাসের জন্য ও প্রাণপণ জোরে শ্বাস টানছিল।

দৌড়ে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। চাবি খুলে ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শনিচারিয়া। পাশে পড়ে আছে তার ধনুক। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও উঠে দাঁড়াল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি আমি আর কখনো দেখিনি।

একটা ওষুধ নিতে যাচ্ছিলাম, শনিচারিয়া আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বামিয়াকে একটু শান্তিতে মরতে দাও, ডাক্তার। ওকে ওষুধ দিয়ে বাঁচালে ওরা তিলে তিলে মেরে ফেলবে।

কঠিন সুরে বললাম, আমি ডাক্তার, শনিচারিয়া। সামনে মরছে আমার রোগী। তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করাই আমার একমাত্র কাজ। পথ ছাড়, এক মূহূর্ত নষ্ট করার সময় আমার নেই।

ওষুধ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। শনিচারিয়া কঠিন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চেষ্টা করলাম। আমার সমস্ত শিক্ষা প্রয়োগ করলাম বামিয়াকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু না, শনিচারিয়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বুক থেকে তীরটা বের করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। সে শ্বাসটুকু সে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না।

সরকারী পুলিশ নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। তারা অনেক আশা করেছিল বামিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাবে। তার কাছ থেকে আদায় করবে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ।

কিন্তু কিছুই হল না। বামিয়া জীবন দিয়ে গুপ্তধনের খবরটুকু গোপন রেখে গেল।

তখন গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও জেগে নেই। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ডিসপেনসিং রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে হল, এখুনি হয়ত বামিয়া এসে ঢুকবে শনিচারিয়ার ঘরে। শুরু হবে গোপন পরামর্শ।

কোথাও কোন সাড়া নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেজান ছিল, নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, শনিচারিয়া অন্ধকার এক কোণে মেঝের ওপর পড়ে আছে। খোলা জানালার ফাঁকে যেটুকু আলো এসে

পড়েছিল, তাতে দেখলাম তার রাশীকৃত খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের রাশে ডুবে গেছে তার সমস্ত মুখখানা।

মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে শনিচারিয়ার মাথায় হাত রাখলাম। ও ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কেমন অর্থহীন চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বামিয়া শান্তিতেই চলে গেছে শনিচারিয়া। তোমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

আমার দিকে তাকিয়ে ও অদ্ভুত হাসি হাসল। পরক্ষণেই আবার কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বললাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে হার মানতে হল, শনিচারিয়া।

ওকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলেনা, ডাক্তার ?

বললাম, তুমি ত ওকে বাঁচাতে চাওনি।

ওকে মেরে সারা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু এখন ভাবছি, ওকে ছাড়া সারা দেশটাই মরে গেল।

শনিচারিয়াকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার ছিলনা। কতক্ষণ শুধু বসে রইলাম নীরবে। ও তাকিয়ে রইল জানালার ফাঁকে উপত্যকার দিকে। দূরের পাহাড় আলো অন্ধকারে রহস্যময়। কি ভাবছে শনিচারিয়া, কে জানে। ঐ ত সেই পাহাড়টা, যার কোলের পথ বেয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে বামিয়া প্রাণপণে দৌড়ে আসছিল। এই সেই জানালা, যার ভেতর দিয়ে ধনু থেকে তীরখানা ছুটে গিয়েছিল ; শনিচারিয়ার অব্যর্থ-লক্ষ্য তীর !

হাসপাতালে এখনও শুয়ে আছে বামিয়া। ভোরের আলোর স্পর্শ পেলে সে হয়ত জেগে উঠবে। জেগে উঠেই লজ্জিত হবে।

সসংকোচে সে ঢুকবে গিয়ে খাবার ঘরে। কত আয়োজন করতে হবে, অথচ ঘুম ভেঙে উঠতে কত দেরী হয়ে গেল তার।

না, সে আর কোনদিন জাগবে না। আমার মিথ্যে কল্পনার পথ বেয়ে সে আর ফিরে আসবে না থলকোবাদের হাসপাতালে।

স্বপ্ন ভাঙল শনিচারিয়ার কথায়।

কেন এমন হল ডাক্তার।

নীরবে আমি বসে রইলাম। শনিচারিয়া বলে চলল, আমি তো ওকে মারতে চাইনি। ওকে আমার এই বুকের ভেতর আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি, কেউ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে হত্যা করুক।

বললাম, তাই হয়েছে শনিচারিয়া। আর কেউ তোমার কাছ থেকে বামিয়াকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

শনিচারিয়া কিছুক্ষণ থামল। তারপর একসময় বলল, কেন তুমি ওকে বাঁচাতে পারলেনা, ডাক্তার। তোমার ওপর কি বিশ্বাস, কি ভরসা আমি রেখেছিলাম।

সাধ্যমত তোমার বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা করেছি শনিচারিয়া, কিন্তু পারলাম না। যুদ্ধ করেছি, শেষে হার হয়েছে আমার।

আরও কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। কত অসংলগ্ন চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল দুজনের ওপর দিয়ে।

একসময় শনিচারিয়া আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে অজস্র যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম, ডাক্তার। শুধু বিশ্বাস কর, প্রাণের থেকে তোমাকে কোনদিন দুঃখ দিতে চাইনি।

তোমার ভেতর এই আশ্চর্য দেশের মূর্তি আমি দেখেছি, শনিচারিয়া। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। বামিয়া মরেছে, সে আঘাত আমার বুকের ভেতর ক্ষত সৃষ্টি করে

গেছে। কিন্তু তুমি না থাকলে আমি সে যন্ত্রণার ভার বইতে পারতাম না। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি আমার চরম দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি, শনিচারিয়া।

ও আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি যে নিজের ভাইকে হত্যা করেছি, ডাক্তার।

এ হত্যা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে গৌরবের, শনিচারিয়া।

ও শান্তভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি আর অসাধারণ হতে চাইনা ডাক্তার। আমি গৌরব চাইনা, চাইনা এ বন্য মানুষের নেতৃত্ব। আমাকে শুধু সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে বাঁচতে দাও। মা যেমন করে তার সন্তান মারা গেলে আকুল হয়ে কাঁদে, আমার বামিয়ার জন্যে আমাকে তেমনি করে কাঁদতে দাও।

ঝর ঝর করে শনিচারিয়ার চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। ওকে একা কাঁদতে দিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দূরের পাহাড়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোর আভাস। পেছনের পাহাড়ে তখনও জমাট অন্ধকার। একটা বাতাস বয়ে এল। সামনের শালবনের পাতাগুলো কেঁপে উঠল থর থর করে।

তারপর দমকা হাওয়ায় তলাকার শুকনো পাতাগুলো করুণ একটা মর্মর ধ্বনি তুলে উপত্যকার দিকে উড়ে চলে গেল।

২রা এপ্রিল ঃ

ডরোথি আর রেবেকা চলে গেছে। হাডসন এসে ওদের নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে এসে খুব দুঃখ করলেন হাডসন।

বললেন, কয়েকটা ঘণ্টা যদি ছেলেটা জ্ঞান ফিরে পেত, তাহলে কত গোপন খবরই না বের করে নেওয়া যেত ওর মুখ থেকে।

বললাম, কি হত বলা যায়না, মিঃ হাডসন। প্রথম বারের লড়াইতে কত চেষ্টাই তো করলেন, কিন্তু পারলেন এক কণা খবর বের করতে। প্রাণে মরল, তবু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না।

হাডসন কিছুসময় চুপ করে থেকে বললেন, ওদের এবার চূড়ান্ত শায়েস্তা করতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের প্রথম কাজ। যারা সরকারের কথা মেনে চলবে, রোজ হাজিরা দিয়ে যাবে, তাদের জন্যে গড়ে তুলব নতুন আস্তানা। দেখি, বুনো জানোয়ারগুলোকে শায়েস্তা করতে পারা যায় কি না।

হেসে বললাম, চেষ্টা করলে একটা কিছু ফল হয়তো পাওয়া যাবে।

হাডসন সক্ষোভে বললেন, ফল অনেক আগেই পাওয়া যেত। কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে বার বার লড়াই লাগছে। তুমি দেখো, ওকে একবার ধরতে পারলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না।

বললাম, একটি জ্বলন্ত বাতি থেকে প্রথমে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরে আর ঐ বাতিটার প্রয়োজন হয়না। আমার মনে হয়, অরণ্যে যে আগুন জ্বলছে, তার জন্যে এখন হয়তো আর শনিচারিয়ার দরকার হবে না।

তুমি জান না, জনসন, এই বনের মানুষগুলো একেবারে অশিক্ষিত। ঐ মেয়েটাই পেছনে থেকে সবকিছু চালাচ্ছে। শুনেছি ওর নাকি যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা আছে। ওর বাবা আমাদেরই দেশ থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসেছিল।

হেসে বললাম, এ তো আমাদের আনন্দের কথা, মিঃ হাডসন। শনিচারিয়া তাহলে আমাদের শিক্ষার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

হাডসন এবার দেশের ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন, সে কথা ঠিক, ডাক্তার জনসন; ঐ মেয়েটির কৃতিত্ব দেখে মাঝে মাঝে আমার শ্রদ্ধা হয়। অবশ্য ওর সবটুকু কৃতিত্বই আমাদের পাশ্চাত্ত্য থেকে পাওয়া।

প্রশংসার শেষে হাডসন নিজের দেশটিকে জুড়ে দিয়ে খুশি হলেন মনে মনে।

হাডসন ওদের নিয়ে যাবার পর আমি হাসপাতালের কাজেই সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখলাম। আমার আগের জীবন আবার ফিরে এল। নিজের হাতে পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। বাবুর্চির কাজ কখনো কখনো আমি নিজেই করতাম। এমনি করে কাজের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলে মনের দিক থেকে অনেকখানি হালকা হয়ে গেলাম।

কেবল যখন শনিচারিয়ার ঘরে ঢুকতাম, তখন একটা ভারী আবহাওয়া আমার চারদিকে এসে ভীড় করত। বামিয়া মারা যাবার পর শনিচারিয়া তার অসমাপ্ত কাজে আর হাত দেয়নি। রোজ গিয়ে দেখতাম, হাঁটুর ভেতর মাথাটি গুঁজে শনিচারিয়া বসে বসে কি যেন ভাবছে। ওকে দেখে মনে হত, একটি জ্বলন্ত বনস্পতির জ্বলন ক্রিয়াটা হঠাৎ থেমে গেছে। এখন তার অগ্নি-দেহটা শত রেখায় ভেঙে খসে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বলতাম, আর কাজ করবেনা, শনিচারিয়া ?

ম্লান হেসে ও বলত, হেরে গেছি, ডাক্তার।

হার স্বীকার করলে চলবে কেন, শনিচারিয়া। তোমার ওপর সারা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বার বার লড়াই এর ভেতর জয়ের কোন আশাই আমি আর দেখতে পাচ্ছিনা ডাক্তার।

মনে হয়, তোমার মত যদি মানুষের সেবা করে, বা অশিক্ষিত মানুষগুলিকে শিক্ষা দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে অনেক কাজ হত। আর এতে নিজের মনেও শান্তি খুঁজে পেতাম।

কথার ভেতর লক্ষ্য করতাম, শনিচারিয়া আজকাল কত শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানেও শনিচারিয়ার ভেতর কোথায় যেন একটা ব্যথার ছায়া আমি লক্ষ্য করতাম। নিজের মনের সেই গভীর যন্ত্রণাকে সে নানাভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত, কিন্তু তার থেকে সে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টাই করতনা। আমার মনে হয়েছে, বার বার ব্যর্থতা, বামিয়ার মৃত্যু, সবকিছুকেই ও মনের গোপনে লালন করবার চেষ্টা করত।

আজকাল মাঝে মাঝে ওর কাছে বসে গল্প করি। ও নিবিষ্ট হয়ে আমার গল্প শোনে। আমি আমার দেশের গল্প করি। আমার দেশের নদীর নাম, নগরীর নাম ওকে শোনাই। নগর জীবনের গল্প করি। আমাদের সমাজ জীবনের ছবি এঁকে যাই।

এই সময়টুকু মনে হয় ও কিছুটা আনন্দ পায়। অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ও নিজেও আলোচনায় যোগ দেয়।

আমাদের দেশের দু'চারটে নদী আর সহরের নাম ও উল্লেখ করে। এগুলো ওর বইএর থেকে জানা নয়, ওর বাবার মুখে ছেলেবেলা শোনা।

আমি ওর কাছে বাইবেলের গল্প বলার চেষ্টা করেছিলাম একদিন।

ও হেসে বলল, বাইবেলের গল্প আমার মুখস্থ রয়েছে, ডাক্তার।

বাবার কাছ থেকে তোমাদের ইংরাজী ভাষাটাই শুধু শিখিনি, বই পড়ার নেশাটাও পেয়েছি।

আমি অমনি বললাম, তাহলে তোমার দেশের উপকথা আমাকে শোনাও।

ও আমাকে অনেকগুলি বিচিত্র উপকথা শোনাল। কোন কোন উপকথার সঙ্গে গ্রীস আর রোমের উপকথার আশ্চর্য মিল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মনে হল, সারা পৃথিবীর মানুষ জাতির মধ্যে কোথায় যেন একটা চিন্তার অবিচ্ছিন্ন মিল রয়েছে। প্রকৃতির নদ নদী, সমুদ্র পর্বত যতই ব্যবধানের সৃষ্টি করুক, সেই অদৃশ্য চিন্তাধারার মিল-টুকুকে তারা নষ্ট করতে পারেনা।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে ডরোথি হঠাৎ হাসপাতালে হাজির।

স্বাগত জানিয়ে বললাম, কি মনে করে ?

বলল, স্কেচের খাতাখানা সেদিন ফেলে গেছি এখানে। বড় অসুবিধে হচ্ছে, তাই চলে এলাম।

মনে হয়, ডরোথির খাতাখানা ফেলে যাওয়া একটা ছলনা। ও আমার সঙ্গে সবার আড়ালে কোন কিছু বলতে চায়।

হেসে বললাম, স্কেচের খাতা ফেলে না গেলে কি আসতে নেই ?

ডরোথি বলল, হাসপাতালে আসার আর একটি মাত্র পথ আছে।

কি ?

কোন একটা অসুখে পড়ে যাওয়া।

তাহলে অবশ্য সে পথ দিয়ে আসতে আপনাকে বারণ করব। যদিও যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে যে কোন ভদ্রমহিলাকে আসতে বারণ করা অভদ্রতা।

ডরোথি বলল, আমি যে আপনার এখানে আজ এসেছি, একথা দয়া করে কাউকে না জানালে খুশি হব।

কেন, বাড়ীতে কাউকে বলে আসেননি বুঝি ?

দিদিকে, এই আসছি বলেই চলে এসেছি।

বললাম, এ সময় একা একা পথে বের হওয়া কি ভাল ?

ভালমন্দ বুঝি না, আসাটা আমার প্রয়োজনের তাগিদে।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। শনিচারিয়ার মনটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আমি ছোটখাট দু'একটা কাজের ভার ওকে দিয়েছিলাম। দুপুরে রোগীদের জন্যে ফল আর দুধ ও সাজিয়ে রেখে যেত। এ সময়টা ও এসে ঢুকত রান্নাঘরে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডরোথির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ডরোথির মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হল। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রান্নাঘরের দিকে।

মুহূর্তে পেছন ফিরে যা দেখলাম, তাতে সহসা আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ডিসপেনসিং রুম থেকে বেরিয়ে শনিচারিয়া রোজকার মত কিচেনে আসছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে ডরোথির।

ও কে, ডাক্তার জনসন ?

মুখে হাসি টেনে বললাম, উনি যে আমার সমজাতীয়া নন, তা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

ডরোথি বলল, দয়া করে এ সময় তাড়াতাড়ি আমার স্কেচের খাতাটা এনে দেবেন কি ?

ডরোথি তাহলে অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। ও নিছক কৌতূহলের বশে শনিচারিয়ার একটা স্কেচ করতে চায়।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওর খাতাটা এনে দিলাম।

ততক্ষণে শনিচারিয়া রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। ডরোথি স্কেচের খাতাখানা নিয়েই দৌড়ল সেখানে। এগিয়ে যেতে যেতে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আসুন ডাক্তার, মুখের এমন গড়ন আর পাওয়া যাবে না।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে ডরোথি ওর হাত ধরে বাইরে টেনে আনল।

ডরোথির পেছনে থেকে আমি শনিচারিয়াকে ইঙ্গিতে কোন কিছু বলতে বারণ করলাম।

শনিচারিয়া বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ডরোথি কাঠের একটা টুলের ওপর বসে রেখায় রেখায় ওকে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। স্কেচ শেষ হলে দেখলাম, শনিচারিয়ার নিখুঁত চেহারাখানা কাগজের বুকে ফুটে উঠেছে।

আঁকা শেষ হলে শনিচারিয়া চলে যাচ্ছিল। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

ও ডরোথির দিকে রহস্যময় দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, ও আপনার কথা বুঝতে না পেরে দেখুন কেমন অবুঝের মত তাকিয়ে রয়েছে। ক'দিন আগে ও এখানে এসেছিল কাজের খোঁজে। ওকে রান্নাবান্নার কাজে বহাল করেছি।

ডরোথি বলল, এ ধরণের মুখ কিন্তু আদিবাসীদের নয়। আমি এই মুখখানা এনলার্জ করে আঁকব।

বললাম, অন্য কোন জাতের মেয়ে হবে হয়তো। ভারতবর্ষে মানুষের মুখের চেহারা এত বিভিন্ন, দেখলে অবাক হতে হয়।

ডরোথি এবার আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথের দিকে

এগিয়ে চলল। আমিও উৎসাহের সঙ্গে নানা কথার অবতারণা করে ওর মন থেকে শনিচারিয়ার ছবিটা মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আমাদের বাংলোতে কবে যাচ্ছেন বলুন?

বললাম, যবে ডেকে পাঠাবেন।

তাহলে আজই চলুন।

হেসে বললাম, বেশ, তাতে আমি রাজি আছি। শুধু আপনার দিদির কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

ডরোথি এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, নিমন্ত্রণ ওখান থেকেই আসবে।

বললাম, তখন যাবার জন্য অবশ্যই তৈরী থাকব।

ডরোথি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। আমি দ্রুত ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে।

শনিচারিয়া আমাকে দেখে বলল, ধরা পড়লাম এতকাল পরে, এতে অগৌরবের কিছু নেই, কি বল?

বললাম, তা হয়তো নেই, কিন্তু ধরা পড়ার দুর্লভ সৌভাগ্যটুকু তুমি এখনও অর্জন করতে পারনি।

কি রকম?

দেখলে তো, ও তোমার নামটুকু পর্যন্ত জানতে পারল না।

শনিচারিয়া বলল, ডরোথি আবার কুম্‌ডির বাংলোতে গিয়ে গল্প না করে।

হেসে বললাম, সে পথ ও নিজেই বন্ধ করে এসেছে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল শনিচারিয়া।

কি রকম?

বললাম, আমার এখানে আসাটা ও গোপন রেখেছে।

হাসি আর থাকতে চায়না শনিচারিয়ার। এতদিন পরে ওর মুখে প্রাণ খোলা হাসি শুনতে পেলাম।

বলল, তাহলে এই হাসপাতালটা সবার গোপনীয় স্থান, কি বল ডাক্তার।

হেসে বললাম, আর আমি সেই গোপন জায়গার মালিকানা ভোগ করি, তাই না ?

কিছুক্ষণ থেমে কি ভাবল শনিচারিয়া। তারপর বলল, তোমার ভেতর কেমন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ডাক্তার। সবাই দেখি তোমাকে খুব ভালবাসে।

বললাম, শুধু একজন ছাড়া।

কি করে তুমি বুঝলে ?

তাকে আমি জানি বলে।

শনিচারিয়া অমনি বলল, আমি তাকে তোমার চেয়ে কিছু কম জানিনা ডাক্তার।

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

এক সময় শনিচারিয়া বলল, ডরোথি খুব ভাল ছবি আঁকে, তাই না ?

হঠাৎ কথার মোড় ফিরল। আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ও আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছে। খুব নিখুঁত ওর হাতের কাজ।

কথা শুনতে শুনতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শনিচারিয়া।

বলল, আমি যদি ছবি আঁকা শিখতাম, তাহলে আমার দেশের এই পাহাড়, শালের বনের কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।

বললাম, কত মানুষ মনে মনে তোমার ছবি আঁকছে। তুমি আবার কার ছবি আঁকবে!

শনিচারিয়া হঠাৎ বলল, আমি আমার বামিয়ার একটা ছবি এঁকে রাখতাম। কেন আর্টিষ্ট হলাম না, ডাক্তার।

আবার সেই পুরোনো কথায় ও ফিরে এসেছে। এখুনি গভীর এক যন্ত্রণার ভেতর তলিয়ে যাবে ওর এই প্রসন্ন মনটা।

তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেললাম, ডরোথির ছবি দেখলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে, শনিচারিয়া।

ও আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তুমি ডরোথিকে খুব ভালবাস, তাই না ডাক্তার ?

এ কথা কেন ?

তার ছবি তোমার খুব ভাল লাগে।

যে গুণী, তার ওপর সকলেরই আকর্ষণ থাকে।

ও কি ভেবে বলল, আমি যদি গুণী হতে পারতাম।

বললাম, ফুল তার নিজের গন্ধ সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই কি বলব, ফুলের গন্ধ নেই।

তাহলে তোমাদের সরকারী লোকেরা কেন আমাকে একটুও পছন্দ করে না !

গুণীরাই গুণীর আদর বোঝে। সরকারী লোক না বুঝলে কিছু এসে যায়না।

তুমি খুব ভাল, ডাক্তার। তোমার মত গুণী আমি দেখিনি।

শনিচারিয়ার মধ্যে আমি যেন অন্য কোন এক জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম। নিজের বিরাট শক্তির কথা ভুলে সামান্য ডরোথির মত মেয়ে হতে পারলে ও যেন সুখী হয়। আমি ডরোথিকে ভাল বলেছি, তাই শনিচারিয়ার গোপন মনে হয়ত একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঁকি দিচ্ছে। ও জীবনের যে দিক সম্বন্ধে এতকাল সচেতন ছিলনা, আজ ধীরে ধীরে সেই

দিকের একটি দরজা মনে হল খুলে যাচ্ছে। শনিচারিয়ার মনে এক চিরন্তনী নারীকে আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে দেখলাম।

১১ই এপ্রিল ঃ

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তখনও প্রকৃতির অগ্নিলীলা শুরু হয়নি। বসন্ত শালের বনে অজস্র ফুল ফোটানোর খেলায় মেতে আছে। পাখীরা ডালে ডালে ফলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে। আদিবাসীদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাদলের বোল বাজছে। বাহা পরবের স্রোত বইছে গানের সুরে। আগুন লাগল। সরকারের অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী বনের অন্ধিসন্ধি খুজে পেতে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলল।

হাহাকার উঠল চারদিকে। অসহায় মানুষগুলো পশুর মত খোলা জায়গায় বনের ভেতর আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশ পথে পাখীরা সারান্দা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে।

হাডসনের এ পরিকল্পনা সরকারকে অনেকদিনের একটা জটিল সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিল। শুনতে পেলাম, বনের মানুষগুলো দলে দলে সরকারী শিবিরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা কথা দিচ্ছে, আর কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেনা। সরকারকে তারা সাহায্য করবে মানুষ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আর সাধ্যমত কর দিয়ে।

কথাগুলো আমার কানে এলো। শনিচারিয়া পাছে দুঃখ পায় সেজন্যে তাকে আর কোন কথা বললাম না।

যখন দূরে কোথাও আগুন লাগত, তখনও বারান্দায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সেদিকে।

আমি পাশে বসে থাকতাম।

এমনি বসে থাকতে থাকতে একদিন শনিচারিয়া বলল, জান ডাক্তার, এ আমার পাপের ফল।

এ কথা কেন বলছ, শনিচারিয়া ?

অনেক ভেবে দেখেছি, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের শুধু ধ্বংসের ভেতর ঠেলে দেবার কোন অধিকার নেই। আমি ওদের দুর্ভিক্ষের সময় খেতে দিতে পারিনি, আশ্রয় দিতে পারিনি, তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করলে কোন ফলই ফলবে না। অসহায় মানুষগুলো আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বললাম, তুমি যা করেছ, দেশকে ভালবেসেই করেছ। তোমার দেশের মানুষকে সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচাতেই তুমি চেয়েছিলে। সেখানে কোন খাদ নেই তোমার চিন্তায়। তবে আজ যাকে পরাজয় বলে মনে করছ, একদিন হয়ত দেখবে, সেই পথেই তোমার জয় আসছে।

শনিচারিয়া নির্বাক বসে তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে ; সেখানে সূর্যাস্তের রঙ আগুনের রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যা নামল। জ্যোৎস্নার ঢেউ আকাশ ছাপিয়ে উপছে পড়ল বনভূমির ওপর। কত শান্ত আর স্নিগ্ধ সে স্পর্শ। মনে হল, আর্ত সন্তানের গায়ে মায়ের কোমল হাতের সান্ত্বনা।

আমরা পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বলেই মনে হল।

শনিচারিয়া তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে আত্মগোপন করল।

দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই ডাক্তার জনসন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয় সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বসলেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটি নাকি আপনার আশ্রয়েই রয়েছে। ডরোথির আঁকা একখানা ছবি দেখে ক্যাপটেন স্মিথ তাকে চিনতে পারেন। তিনি নাকি তাকে ছাতমবুরুর লড়াইএর সময় দেখেছেন। তারপর ডরোথিকে ওরা জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিয়েছে।

আজ শেষ রাতে পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধান থাকবেন ডাক্তার জনসন।

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। গোপনতা কেন; আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিয়াকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অরণ্য কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে চাইলে আশাকরি ইংরাজ সরকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারান্দার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিয়াকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথা-গুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারিয়া। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন সহজ মুখ-ভাব নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শনিচারিয়া অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, আমাকে আজ একটি অনুমতি দিতে হবে ডাক্তার; আর কোনদিন এমন করে তোমার কাছে চাইব না।

কিসের অনুমতি?

আগে কথা দাও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে?

কথা দিলাম।

এই জ্যোৎস্না রাতে বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে বড় ইচ্ছে করছে। চল আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।

.একটু ভেবে বললাম, ঘোড়া মাত্র একটি; দু'জনে যাব কি করে?

আমার ঘোড়া সন্ধ্যে হলেই হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি তৈরী হয়ে এসো, আমি ওদিক দিয়ে পথে বেরিয়ে যাচ্ছি।

আমি পোষাক পরে বেরিয়ে এলাম ঘোড়া নিয়ে। পথের বাঁকে পৌঁছে দেখি শনিচারিয়া তার ঘোড়ায় চেপে অপেক্ষা করছে।

ওর মুখোমুখি হয়েই গম্ভীর গলায় বললাম, পথ হারিয়ে এ অঞ্চলে এসে পড়েছ বুঝি। এ জায়গাটা আদিবাসীদের নেত্রীর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

আমার কথা বলার ভঙ্গী দেখে ও হেসে ফেলল।

তুমি আমার কথার শোধ নিচ্ছ ডাক্তার জনসন?

বললাম, মনে আছে শনিচারিয়া, ছোট নাগরার পাহাড়ের বাঁকে

যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়, সেদিন তুমি আমাকে এমনি একটা কথা বলেছিলে।

সেখানেও এমনি পাহাড়ের বাঁকে আমরা ঘোড়ায় চড়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম।

বললাম, সেদিন তুমি আমাকে বর্ষার আগেই নদী পার করে দিয়ে গেলে। আমরা বিদায় নেবার ঠিক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি সারাপথ আসতে আসতে কেবল ভেবেছি, নদীতে বান আসার আগেই তুমি পেরিয়ে যেতে পেরেছ কি না।

শনিচারিয়া বলল, আজও কিন্তু তোমার সেকথা জানা হয়নি।

বললাম, তোমাকে সশরীরে হাসপাতালের ভেতর পেয়ে আর সব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে ও বলল, প্রায় সারাটি রাত আমাকে সেদিন কাটাতে হয়েছে নদীর এপারে।

আমি খুবই লজ্জিত শনিচারিয়া।

ও হেসে বলল, এই সামান্য কারণে এতদিন পরে তুমি যদি লজ্জা পাও তাহলে তোমার কাছে আমার লজ্জার যে সীমা থাকে না।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলাম। এখন ঝর্ণাটি ক্ষিণাঙ্গী, তবু নুড়ির নূপুর বাজিয়ে সে উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছে।

শনিচারিয়া সেখানে দাঁড়াল। আমিও তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কতক্ষণ সে ঝর্ণাটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, জান ডাক্তার, এই ঝর্ণার ধারে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা আজও আমার কাছে বড় রহস্য জনক হয়ে আছে।

ঘটনাটি শোনার জন্যে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

শনিচারিয়া বলতে লাগল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা

একবার এই পথ দিয়ে ছোট নাগরার দিকে যাচ্ছিলাম। তখনও বেলা ছিল। আমরা এই ঝর্ণাটার প্রায় কাছাকাছি এসে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম।

কাছে এসে দেখি, ঝর্ণায় জল খেতে এসে একটা হরিণ বাঘের কবলে পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, ভয়ে হরিণটা একটা বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছে। আসন্ন প্রসবা ছিল সে। আমরা হৈ চৈ করায় বাঘটা সরে গেল বনের ভেতর। আমি বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম কোলে। হরিণটা তখুনি মারা গেল। বাচ্চাটা নিলাম, কিন্তু তাকে লালন পালন করা এক সমস্যা। যাহোক অনেক চেষ্টায় বাচ্চাটা বড় হল। দেখতে দেখতে সে বিরাট আকার ধরল। শিং জোড়া হল তার দেখবার মত। ওকে ছেড়ে দিতাম ; সারাদিন ঘুরে ফিরে ও আবার ঠিক ফিরে আসতো আমার ঘরে।

একদিন চরতে গিয়ে ও আর ফিরে এলো না। পরের দিন চারদিকে লোক পাঠালাম ওর খোঁজে।

এক রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। এই ঝর্ণার ধারে আমার হরিণটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার ধারাল শিংএর ভেতর বিঁধে আছে একটা চিতা বাঘ। বাঘটাও মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম, আমার আস্তানার কাছেপিঠে এত ঝর্ণা থাকতে হরিণটা এত দূরেই বা এল কেন !

এ রহস্যের সমাধান আজও পাইনি।

কথাটা শুনে আমিও বিস্মিত হলাম। হরিণটা কি তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল।

আমরা ঝর্ণাটা পেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা। ওপরে বন, নীচে উপত্যকার

কোথাও কোথাও বন ; আবার কোথাও লোক বসতি। আমরা অনেক পথ পার হয়ে চললাম।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল শনিচারিয়া। পাহাড়ের ওপর থেকে একটা সল্টলিক্ নীচে ভ্যালির দিকে নেমে গেছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো।

আমি ওকে অনুসরণ করে নীচে নামতে লাগলাম। আমরা খুব ধীরে ধীরেই নামলাম। ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে নুড়ি পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। নামতে নামতে শনিচারিয়া আমাকে বার বার হুসিয়ার করে দিল।

এক সময় আমরা নেমে এলাম পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের উপত্যকায়। কিছু পথ বনের ভেতর দিয়ে চলার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। মনে হল এ স্থানটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল।

শনিচারিয়া বলল, এ গ্রামখানা সরকার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। দেখছ না, ভাঙা দেয়াল, কালো কালো পোড়া চিহ্ন।

বললাম, এই নির্জন কবর ভূমিতে হঠাৎ এলে কেন ? এখানে তো কোন মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

ও কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, দেবতা জেগে আছেন ডাক্তার, আর রয়েছে মৃত মানুষের আত্মা।

কতক্ষণ এদিক ওদিক ও যেন কি খুঁজতে লাগল। এক সময় আমরা গাঁয়ের শেষে এসে পৌঁছলাম। এখানে পোড়া জিনিসের আর কোন চিহ্ন নেই। এক জায়গায় কতকগুলো গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। শনিচারিয়া সেখানে এসে ঘোড়া থামিয়ে নেমে

পড়ল। ঐ গাছগুলোর নীচে অজস্র পাথর ঠিক বেদীর মত করে বাঁধান রয়েছে।

ও তারই তলায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। অর্ধ উচ্চারিত একটা সুরেলা ধ্বনি মাঝে মাঝে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

এক সময় ওর প্রার্থনা শেষ হল। ধীরে ধীরে ও উঠে এল বেদীর কাছ থেকে। জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখলাম, ওর মুখ বেদনায় থম থম করছে; কিন্তু একটি বিশেষ দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে ওর মুখে।

ও ঘোড়ায় উঠল। আমরা আবার ফিরে চললাম।

একসময় ও বলল, জান ডাক্তার, যে বেদীর কাছে বসে আমি এতক্ষণ প্রার্থনা করলাম, ওখানে আমার বামিয়া রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকত। কোন আশ্রয় ছিল না আমার বামিয়ার। বন দেবতা 'জায়েরা' তাকে রাতের আশ্রয় দিত। ওর আত্মার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে গেলাম।

আমরা আবার সেই সল্ট লিক্ ধরে পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম।

শনিচারিয়া বলল, ঐ যে দূরে পাশাপাশি দুটো পাহাড় দেখছ, ওর তলায় যে উপত্যকা, সেটি আমার জন্মস্থান। আমার কত দিনের খেলার আশ্রয়। সব ফেলে এসেছি ডাক্তার। ঘোড়া থেকে নেমে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একসময় বলল, জান ডাক্তার, এই সময়ে সারা বন জুড়ে চলত বাহা পরব। এই বনভূমির প্রতিটি গ্রাম থেকে বাহা পরবের দল আমাদের ঐ ছোট নাগরায় গিয়ে ভীড় জমাত। মেয়ে পুরুষের নাচ গান আর উৎসব আনন্দে ক'দিন ছোটনাগরার আকাশ বাতাস, বন পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত।

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, হাজার হাজার মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে, শত শত অরণ্য কন্যার কণ্ঠের বিচিত্র সুরধ্বনি।

শনিচারিয়াও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। গুণ গুণ করে তার সুরেলা গলা তুলতে লাগল বিচিত্র সুরের ঢেউ।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। শনিচারিয়া আমাকে লক্ষ্য করল না। সে আপন মনে সেই জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের নীচে অরণ্যবাসরে তার অতীত দিনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলল।

আমি মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী শনিচারিয়াকে দেখতে লাগলাম।

একসময় পাহাড়ের কাছে গিয়ে লতাগুল্মের থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আনলাম।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম শনিচারিয়ার কাছে। ও তখনও নিজের ভেতর মগ্ন হয়েছিল। কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। কেমন মোহাচ্ছন্ন চাহনি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। এ দেশের মেয়েরা যেমন করে খোঁপায় ফুল গোঁজে, আমি তেমনি করে ওর খোঁপায় একরাশ ফুল পরিয়ে দিলাম। ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর হাত ধরলাম। দু'জনে একবার তাকালাম ছোটনাগরার সেই ধূমল পাহাড়ের দিকে।

একসময় ফিরে এলাম আমাদের পরিচিত জগতে। থলকোবাদের হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছলাম তখন চাঁদ অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখেমুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

বিছানায় যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

বলল, তুমি শোও ডাক্তার, আমি আজ তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ও বসে বসে আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। কি যাদু ও হাতের, আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিষ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ল্যাম্প জ্বেলে ঢুকলাম শনিচারিয়ার ঘরে। ঘর শূন্য। বেরিয়ে এলাম পথের ওপর। অন্ধকার তখনও জমে আছে। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ ত, শনিচারিয়া পড়ে আছে পথের ওপর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করলাম, শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

শ-নি-চা-রি-য়া······

থর থর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

অতি ক্ষীণ আহত গলায় ও বলল, আমি মরতে চাইনি ডাক্তার।

তবে কেন এমন করলে ?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারিয়া।

তোমার দেশে ! অস্পষ্ট যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করল ও।

হাঁ, শনিচারিয়া আমার দেশে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করব মনে করেছিলাম।

যন্ত্রণার ভেতরেও একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল শনিচারিয়ার মুখে। ওর একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল ও।

কাছে গেলাম। ও ধীরে ধীরে বলল, আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। কথা দাও, আমার দেশের মানুষকে আমার মতই তুমি ভালবাসবে। কোনদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল।

অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে, আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

* * * *

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়েরী পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন সেই বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে, ঐ বেদী বাঁধানো আদিংএর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়েরীখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে, ইনিই কি ডাক্তার জনসন। আমারও তাই মনে হয়েছিল।